ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

মনজুর-ই-খোদা
শাহজাদা এম আকরাম

৯ মার্চ ২০১৭

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপার্সন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা সহযোগী

গোলাম মহিউদ্দিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তথ্যদাতা, সংবাদমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কার্যক্রমকে পরিচালনা ও প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসানসহ অন্যান্য সহকর্মী, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচি

মুখবন্ধ	৪
প্রথম অধ্যায়: **ভূমিকা**	**৫**
১.১ শ্রম অভিবাসনের প্রেক্ষাপট	৫
১.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষণা পর্যালোচনা	৮
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা	১০
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	১০
১.৫ গবেষণার আওতা	১১
১.৬ গবেষণা পদ্ধতি	১১
১.৭ গবেষণার সময়	১১
১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়: **শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**	**১২**
২.১ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি কাঠামো	১২
২.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কাঠামো	১৬
২.৩ সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ	২৩
২.৪ উপসংহার	২৪
তৃতীয় অধ্যায়: **শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া**	**২৫**
৩.১ গন্তব্য দেশে কার্যাদেশ/ চাহিদাপত্র সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ	২৫
৩.২ বাংলাদেশে ভিসা বিক্রি	২৮
৩.৩ ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ	৩০
৩.৪ উপসংহার	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়: **শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণ ও প্রভাব**	**৩৬**
৪.১ আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা	৩৬
৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা	৩৭
৪.৩ প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা	৩৮
৪.৪ আইন প্রয়োগে ঘাটতি	৪০
৪.৫ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ	৪১
৪.৬ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব	৪২
৪.৭ উপসংহার	৪৪
পঞ্চম অধ্যায়: **উপসংহার ও সুপারিশ**	**৪৫**
৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৪৫
৫.২ সুপারিশ	৪৫
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গবেষণা	৪৭

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের চাপ কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও মজুদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রম অভিবাসন খাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি প্রধানত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-নির্ভর একটি খাত। এ খাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই মূলত সেবা নেওয়া হয়। শ্রম অভিবাসীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি। এ খাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ অভিবাসনের অনুমোদন দেওয়া এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রক্রিয়াজাত করা।

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও উদঘাটন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের অপর্যাপ্ততা ঝুঁকিপূর্ণ অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচারকে উৎসাহিত করে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে। শ্রম অভিবাসন খাতে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান, রেমিটেন্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় এই বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মনজুর-ই-খোদা এবং শাহজাদা এম আকরাম। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাদেরকে সহায়তা করেছেন গোলাম মহিউদ্দিন। গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তথ্যদাতা, সংবাদমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি অভিবাসী কর্মী যারা বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাটি পরিচালনায় টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও সহায়তার জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গবেষণার মানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতি নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ শ্রম অভিবাসনের প্রেক্ষাপট

অভিবাসী শ্রমিক তাদের বলা হয় যারা কাজের জন্য নিজেদের শহর বা দেশের বাইরে যায়। নিজের দেশের ভেতরে যারা কাজের জন্য অন্য জায়গায় যায় তারা ‘অভ্যন্তরীণ’, এবং যারা নির্দিষ্ট মেয়াদে নিজেদের দেশের বাইরে যায় তাদের ‘আন্তর্জাতিক’ অভিবাসী শ্রমিক বলে। এসব অভিবাসী সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত কর্মসূচি, ব্যক্তিগত বা বেসরকারি কর্মসংস্থান বা নিজস্ব উদ্যোগে দেশের বাইরে যেতে পারে (স্টকার ২০০৮)। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী ‘অভিবাসী কর্মী’ অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরিশ্রমিকের বিনিময়ে (ক) কোনো কর্মের উদ্দেশ্যে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন বা গমন করছেন, অথবা (খ) কোনো কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, অথবা (গ) কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকার পর কিংবা নিযুক্ত না হয়ে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন।[১]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের চাপ কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও মজুদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২] শ্রম অভিবাসনের ফলে প্রথমত, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পায়। প্রত্যেক বছর দেশের মোট শ্রমশক্তিতে যতজন যুক্ত হয় তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি, আর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উৎপাদন খাতে যোগ হওয়া কাজের অর্ধেকের বেশি হচ্ছে অভিবাসী কর্মী।[৩] দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment) বজায় রাখতে সাহায্য করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার, এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৩১ কোটি ডলার।[৪] প্রবাসী আয় প্রবাহের পরিমাণ বাংলাদেশে অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ যথা আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (Official Development Assistance) এবং নীট রপ্তানি আয়কে (Net Earning from Export) অতিক্রম করেছে।[৫] উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ সালে প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৭৭% এবং ২০১৪-১৫ সালে ৬১% ছিল।[৬] ২০১৫ সালে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের জিডিপি’র প্রায় ৭.৮৩%।[৭] এছাড়া ফেরত আসা অভিবাসীদের বিনিয়োগ ও কারিগরি দক্ষতার কারণে জাতীয় উন্নয়নে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর ইতিহাস অনেক পুরানো। ১৮ শতক ও ১৯ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশ থেকে (মূলত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী হতে) ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহে খালাসি ও বাবুর্চি হিসেবে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে পাশ্চাত্যে অভিবাসন শুরু হয়। সিলেট অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ কলকাতার হুগলির ডকইয়ার্ড ও বাণিজ্য জাহাজে কাজ নেয়। ১৯৭১-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ার পর পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়, যেখানে বিপুল পরিমাণ অভিবাসী শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, যে প্রয়োজনের একটি বড় অংশ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে মেটানো হয়। প্রায় একই সময় থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

---

[১] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ২ (৩)। তবে অভিবাসী কর্মীর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি যিনি তার সাথে বিদেশে অবস্থান করছেন তাকেও অভিবাসী কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

[২] উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজ নিয়ে যাওয়া অভিবাসীদের সংখ্যা ৭ লাখ ৫৭ হাজার ৭৩১ জন। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৮৮১ জন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20 (২৩ জানুয়ারি ২০১৭)।

[৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এডিবি, ‘Overseas Employment of Bangladeshi Workers: Trends, Prospects, and Challenges’, ব্রিফ ৬৩, আগস্ট ২০১৬, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190600/overseas-employment-ban-workers.pdf (৫ মার্চ ২০১৭)।

[৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

[৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬*, পৃ. ৮।

[৬] এডিবি, *প্রাগুক্ত*

[৭] ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপি’র পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯৫.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং ২০১৫ সালে মোট ১৫,২৭০.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসে। সূত্র: http://www.tradingeconomics.com/bangladesh/gdp (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

কয়েকটি নব্য শিল্পোন্নত দেশেও প্রবাসী শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয় (সিদ্দিকী, ২০০৯)। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অভিবাসী গোষ্ঠী হলো বাংলাদেশের নাগরিকেরা। বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লাখ নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন।[৮]

১৯৭৬ সাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন কিছু কিছু সময়ে নিম্নমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। গত দশবছরের প্রবণতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০০৮ সালের পর থেকে শ্রম অভিবাসনের সংখ্যা ব্যাপকহারে ওঠানামা করেছে, এবং এটি সার্বিকভাবে স্থিতিশীল ছিল না। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৯০ হাজার ৭০২ জন, যা পরবর্তী দুইবছরে বাড়লেও ২০১৩ ও ২০১৪'তে তা আবারও হ্রাস পায়। তবে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে এই সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। শ্রম অভিবাসন ওঠা-নামার অন্যতম কারণ ছিল বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী কর্মী নেওয়া বন্ধ থাকা। যেমন সৌদি আরবে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল ছয় বছর যা ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহার করা হয়। তবে গত দেড় বছর নারী গৃহকর্মীদের পাশাপাশি শুধু গৃহখাতের শ্রমিক নেয় দেশটি। কিন্তু এ বছরের ১১ আগস্ট সব ধরনের কর্মী নিয়োগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেয় দেশটির শ্রম ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।[৯] আবার মালয়েশিয়াতেও বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ প্রায় চারবছর বন্ধ থাকার পর ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর কর্মী পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ জি-টু-জি (সরকারিভাবে) চুক্তি করে মালয়েশিয়ার সঙ্গে। কিন্তু এই চুক্তির আওতায় তিন বছরে মাত্র ১০ হাজার কর্মী দেশটিতে যায়। চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি জি-টু-জি প্লাস (সরকারি ও বেসরকারিভাবে) পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার সমঝোতা স্মারকে সই করে। কিন্তু এর ১২ ঘন্টার মধ্যেই মালয়েশিয়া জানায়, এই মুহূর্তে তারা আর কোনো কর্মী নেবে না।[১০] এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশেও শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল বা আছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন (১৯৭৬ – ২০১৬)

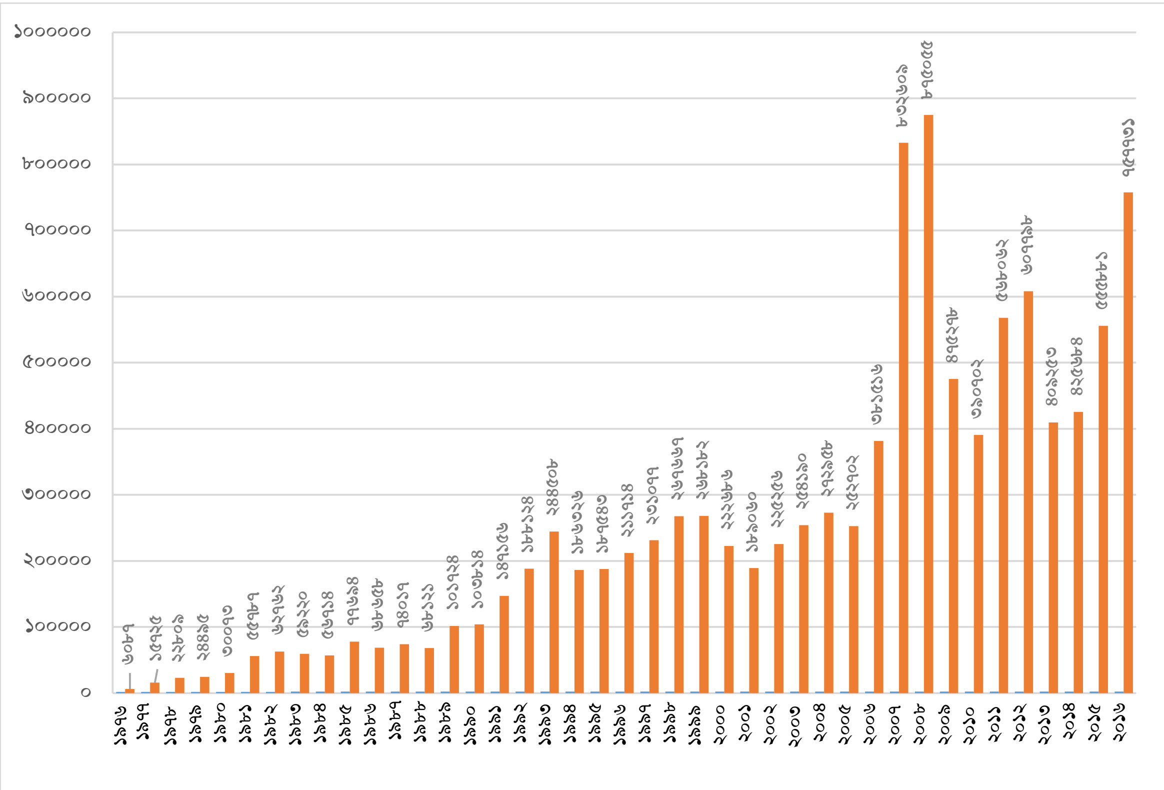

তথ্যসূত্র: বিএমইটি'র ওয়েবসাইট: http://www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20 (২৩ জানুয়ারি ২০১৭)।

[৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন McKinsey Global Institute, 2016, *People on the Move: Global Migrations's Impact and Opportunity*, http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

[৯] *দৈনিক প্রথম আলো,* ৩০ আগস্ট ২০১৬।

[১০] *দৈনিক প্রথম আলো,* ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজ করতে যাওয়া অভিবাসী কর্মীদের সিংহভাগ অংশই গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে (মোট শ্রম অভিবাসীর ৭৯%) (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য), যার মধ্যে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত শীর্ষ দুটি গন্তব্য দেশ।[১১] এসব অভিবাসী কর্মীদের বেশিরভাগ অদক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত; এরপরেই রয়েছে দক্ষ ও আধা-দক্ষ/ অন্যান্য।[১২] শ্রম অভিবাসন খাতে শুরুর কয়েক দশক নারী কর্মীদের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ১৯৯০-এর দশকের শেষে নারীকর্মীদের বিদেশে যাওয়ার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে এই হার গত কয়েক বছর ধরে বাড়ছে।[১৩]

চিত্র ২: বাংলাদেশ থেকে অঞ্চলভিত্তিক শ্রম অভিবাসনের হার (১৯৭৬ - ২০১৬)

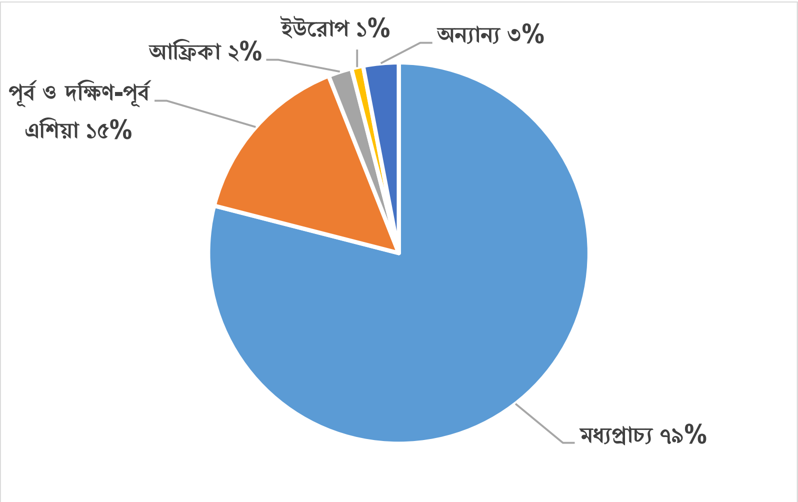

তথ্যসূত্র: বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী তৈরি: http://www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20 ।

শ্রম অভিবাসন খাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি প্রধানত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-নির্ভর একটি খাত। এ খাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই মূলত সেবা নেওয়া হয়। শ্রম অভিবাসীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি।[১৪] এ খাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ অভিবাসনের অনুমোদন দেওয়া এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রক্রিয়াজাত করা। এ খাতে জড়িত সরকারি অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/ লেবার অ্যাটাশে, এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে রিক্রুটিং এজেন্ট, দালাল, এবং ট্রাভেল এজেন্ট।[১৫]

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন খাতে সেবা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার জন্য ১৯৭৬ সালে তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণলয়ের অধীনে 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং ১৯৮২ সালে 'বহির্গমণ আদেশ, ১৯৮২' প্রণয়ন করা হয়। শ্রম অভিবাসন খাতের উন্নয়নে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় ২০০১ সালে। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে, এবং বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে।[১৬] এসব আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ভরযোগ্য সমতাভিত্তিক ও মানবিক অবস্থানকে উৎসাহী করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত ও নিরাপদ

[১১] বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের প্রায় ২৭% সৌদি আরব ও প্রায় ২৩% সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গন্তব্য দেশ হচ্ছে ওমান (১২.০৩%), মালয়েশিয়া (৭.৫৬%), সিঙ্গাপুর (৬.২৪%), কাতার (৫.৬৪%), এবং বাহরাইন (৩.৬৬%)। তথ্যসূত্র: http://www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20 (২৩ জানুয়ারি)।

[১২] ১৯৭৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের ৪৮.৯৫% ছিল অদক্ষ, ৩২.৫১% দক্ষ, ১৫.২% আধা-দক্ষ, ২.১৮% পেশাদার, এবং ১.১৭% অন্যান্য। ২০১৬ সালে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের ৪০.০৮% ছিল অদক্ষ, ৪২.০৮% দক্ষ, ১৫.৮৩% আধা-দক্ষ. ০.৬১% পেশাদার, এবং ১.৪% অন্যান্য। তথ্যসূত্র: http://www.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=35 (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

[১৩] উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে নারী অভিবাসী কর্মীর হার ছিল ১৮%, যেখানে ২০১৩ সালে এটি ছিল মোট অভিবাসী শ্রমিকের ১৩.৭৮%। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://bmet.gov.bd ।

[১৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিদ্দিকী ও রশীদ (২০০৯)।

[১৫] শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য দেখুন এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

[১৬] শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি কাঠামোর জন্য দেখুন এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহী, এবং প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষণা পর্যালোচনা

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন নিয়ে প্রচুর গবেষণা রয়েছে। এসব গবেষণার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসনের কারণ, শ্রম অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, শ্রম অভিবাসনের লৈঙ্গিক ভিন্নতা ও এর ফলাফল, অভিবাসনের ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সমস্যা, বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, অভিবাসন-পরবর্তী সমস্যা, এসব সমস্যা মোকাবেলায় অংশীজনের ভূমিকা, রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া ও ব্যবহার, গন্তব্য দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা, ব্যয়ের খাত, অভিবাসী কর্মীদের পরিবারে রেমিট্যান্সের প্রভাব, দেশে ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের পুনরায় আত্তীকরণ, এবং সর্বোপরি শ্রমের অভিবাসনের সর্বোচ্চ কার্যকরতা নিশ্চিতকরণ উল্লেখযোগ্য।[১৭]

অভিবাসনের সুশাসন একটি জটিল ধারণা যেখানে ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ ব্যাপক ও বিস্তৃত অংশীজন জড়িত। এ কারণে অভিবাসনের সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বেটস (২০১১) এর মতে অভিবাসনের সুশাসন হচ্ছে "একগুচ্ছ রীতি, নিয়ম, নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যা কোনো জাতি-রাষ্ট্রের ওপরের পর্যায়ে অবস্থিত"। অন্যদিকে কুনজ, লাভেনেক্স ও পানিজন (২০১১) এর মতে অভিবাসনের সুশাসন হচ্ছে 'অভিবাসন অংশীদারিত্ব'র ওপর ভিত্তি করে তৈরি ধারণা যেখানে আন্তর্জাতিক অভিবাসন রাজনৈতিকভাবে শাসিত ও পরিচালিত হয়। এর অর্থ অভিবাসনে উৎস, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের মধ্যে সমানভাবে অংশীদারিত্ব পদ্ধতির দায়িত্ব ও এর সুবিধার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রম অভিবাসনের সুশাসনের ঘাটতি অভিবাসীদের ক্ষতি, বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে। এটা মানবপাচার, এবং একইসাথে সামাজিক অস্থিরতা, বিদ্বেষ ও বৈষম্য উৎসাহিত করতে পারে। অভিবাসনের ব্যয় কমানোর মাধ্যমে এর সুফল নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর অভিবাসন ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য (ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৬)। বেটস (২০১০) তাঁর গবেষণায় অভিবাসনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন শরণার্থী, অবৈধ অভিবাসন, শ্রম অভিবাসন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করার সময় এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেন। এসব চ্যালেঞ্জ দূর করার জন্যে তাঁর প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে অভিবাসন নিরাপত্তার জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আদর্শভিত্তিক বৈশ্বিক অভিবাসন সুশাসন ব্যবস্থা, সংলাপের জন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুপাক্ষিক উন্মুক্ত ফোরাম, উন্নত সমন্বয় ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে তিনি আরেকটি গবেষণায় (২০১১) বৈশ্বিক অভিবাসনের তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈশ্বিক অভিবাসন সুশাসন কী, রাজনৈতিকভাবে এর অস্তিত্ব এবং বৈশ্বিক অভিবাসন শাসনের উন্নয়নের বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করে। গবেষণাটিতে স্বার্থ, ক্ষমতা ও ধারনার আলোকে বৈশ্বিক অভিবাসন শাসনের রাজনীতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং বৈশ্বিক অভিবাসন শাসনের আদর্শিক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে দক্ষতা, সাম্যতা, বৈধতা ও অধিকারের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন সিদ্দিকী (২০০২)। তিনি শ্রম অভিবাসনকে জটিল বলে চিহ্নিত করেন, এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার সুপারিশ করেন। রামরু'র (২০০২) একটি গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমত, এর সাথে একাধিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সি জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি, বেসরকারি, স্থানীয় বা বিদেশী অংশীজন। দ্বিতীয়ত, পুরো প্রক্রিয়া একদল মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা পরিচালিত; এদের কোনোটি আনুষ্ঠানিক আবার কোনোটি অনানুষ্ঠানিক, আর অন্যরা দ্বৈত ভূমিকা পালনকারী। তৃতীয়ত, আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে বিধি-বিধান, বাস্তবায়নকারী ও তদারক কর্তৃপক্ষ রয়েছে যাদের কারণে এই প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়েছে। এখানে আরও বলা হয় শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। স্বচ্ছতার ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যয়, বিদেশে কাজের শর্ত, রেমিট্যান্স ইত্যাদি। এসব বিষয়ে তথ্য সহজলভ্য নয়, আর এসব তথ্যের জন্য বিএমইটি'র ব্রিফিং ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক আর কোনো ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ২০১৪-এর সম্মেলনে তিনটি নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অভিবাসন সুশাসন কাঠামোটি প্রণয়ন করা হয়। তিনটি নীতি হচ্ছে (১) আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতি রেখে ও অভিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অভিবাসনের সুশাসন সম্পর্কে ভাবতে হবে; (২) সরকারের সামগ্রিক ঝোঁক ও প্রমাণভিত্তিক তথ্যের সাপেক্ষে সবচেয়ে ভাল নীতিমালা তৈরি করা যায়; (৩) অভিবাসনের সুশাসন শক্তিশালী অংশীদারিত্বের ওপর নির্ভর করে (আইওএম, ২০১৫)। পরবর্তীতে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'কে (এসডিজি)

---

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আফসার ও অন্যান্য (২০০১), আফসার (২০০৯), সিদ্দিকী (১৯৯৮; ২০০০; ২০০৯), সিদ্দিকী ও রশীদ (২০০৯), সিদ্দিকী ও মাহমুদ (২০১৫), সিদ্দিকী ও আবরার (২০০১), সিদ্দিকী ও অন্যান্য (২০১০), রামরু (২০০২), মুরশিদ ও অন্যান্য (২০০১), বিলস (২০১৪), এশিয়া ফাউন্ডেশন (২০১৩), রহমান (২০১১)।

সামনে রেখে একটি অভিবাসন সুশাসন সূচক তৈরি করা হয়, এবং এর ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ১৫টি দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। এই সূচকের প্রধান ক্ষেত্র পাঁচটি - (১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, (২) অভিবাসীর অধিকার ও একীভূতকরণ, (৩) অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, (৪) শ্রমিক, অর্থনীতি ও বিনিয়োগ, এবং (৫) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব (ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৬)।

এশিয়ায় স্বল্পমেয়াদী শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নিয়োগ। বিদ্যমান বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয় যে এশিয়ায় শ্রম অভিবাসনের সাথে সাথে রিক্রুটিং এজেন্সি ও অভিবাসী নেটওয়ার্ক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অধিকাংশ লেখায় রিক্রুটিং এজেন্সির ভূমিকা অথবা নেটওয়ার্কের ভূমিকার ওপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত রয়েছে, কিন্তু একসাথে আলোচিত হয় নি। একইভাবে এশিয়ায় নিয়োগের অর্থনীতি শ্রমিক নিয়োগ থেকে প্রায় অবিচ্ছিন্ন হলেও বিদ্যমান গবেষণায় এটি অবহেলিত রয়ে গেছে। রহমান (২০১১) তার গবেষণায় অভিবাসী নিয়োগের জটিল প্রক্রিয়া বোঝার জন্য অভিবাসী নেটওয়ার্ক ও নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক নিয়োগ উভয় দিক যে একসাথে আলোচনা করা প্রয়োজন তার ওপর জোর দিয়েছেন, এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক দিক পর্যালোচনা করেছেন।

আচাকোসো (২০০২) বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনের শ্রম অভিবাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার তুলনা করে করা একটি গবেষণায় অভিবাসন ব্যবস্থার মানসম্মত কাঠামো ও প্রয়োগ, প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্টদের তদারকি, বিতর্ক ও দাবি নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন, যেখানে তিনি বলেন যে কোনো দেশের শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সুশাসন, জাতীয় আইনসমূহ, দ্বিপাক্ষিক শ্রম ব্যবস্থা, আচরণবিধি, আন্তসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বায়িত্ব ও ওয়াচডগ সংস্থা প্রভৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সমস্যার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকটবহুল নিয়োগ ও শোষণমূলক কাজের পরিবেশ তৈরি হয়। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে ভিসা বাণিজ্য, লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা, কর্মীদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ, অভিবাসনের উচ্চ ব্যয় (সিদ্দিকী ও অন্যান্য, ২০১২)। কী প্রক্রিয়ায় ভিসা বাণিজ্য হয় এবং এই বাণিজ্যের কারণে কীভাবে ভিসার দাম বেড়ে যায় তা আলোচনা করা হয়েছে কয়েকটি গবেষণায় (সিদ্দিকী ও অন্যান্য, ২০১২; রহমান, ২০১১; সিদ্দিকী, ২০১১)। উপসাগরীয় অঞ্চলে শ্রম অভিবাসনের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও এর অর্থনৈতিক পর্যালোচনার উপর সম্পন্ন করা গবেষণায় রহমান (২০১১) দেখিয়েছেন একজন কর্মীর মোট অভিবাসন ব্যয়ের ৭৭ শতাংশ দালালদের পকেটে যায়।

অভিবাসী কর্মীদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও এর প্রয়োগে এখনো ব্যাপক সমস্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগ, প্রশাসনিক ও বহির্গমন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পর্যায়ে দুর্নীতি ও প্রভাব বিস্তার বিদ্যমান বলে অভিযোগ রয়েছে (রশিদ, ২০১৫)।[১৮] বর্তমান আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র শুধু শ্রম অভিবাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তদারকি ও নিয়ন্ত্রণই নয় বরং প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিও করার কথা। কিন্তু যথাযথ তদারকির ঘাটতির কারণে অভিবাসন-পূর্ব বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এ প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, মধ্যস্বত্বভোগী বা 'দালাল'দের হয়রানি, বিভিন্ন কারণে অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি এবং উচ্চ অভিবাসন ব্যয় (রশিদ, ২০১৫)। একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী শ্রম অভিবাসনের গড় ব্যয় সৌদি আরবের জন্য ৬.৭৬ লাখ টাকা, মালয়েশিয়ার জন্য ২.৬ লাখ টাকা, ওমানের জন্য ২.৫ লাখ টাকা (সিদ্দিকী ও মাহমুদ, ২০১৫)। আরেকটি গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের প্রকৃত ব্যয়ের প্রায় সাতগুণ বেশি ব্যয় করতে হয় (আইএলও, ২০১৪)।

এ খাতে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উল্লেখযোগ্য। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতদের ৭৭% দুর্নীতির শিকার হয়, এবং এ খাতে নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত যাদের ব্যয় করতে হয়েছে তার গড় পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৭৬ টাকা (টিআইবি, ২০১২)।

অভিবাসন-পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া, পাসপোর্ট আটকে রেখে জিম্মি করে রাখা বা শ্রমদাস হিসেবে ব্যবহার করা, নির্যাতনের মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা, মৌলিক মানবাধিকার যেমন মানসম্পন্ন আবাসন, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা, চলাচল, বিনোদন ইত্যাদির লঙ্ঘন, বাংলাদেশি দূতাবাসের দুর্বল ভূমিকা, আইনি সহায়তার অভাব, প্রতারণা শিকার ও নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া ইত্যাদি (আফসার

[১৮] মো. হারুন-অর-রশিদ, 'এনশিউর বেটার গভার্নেন্স ফর সেফ মাইগ্রেশন', *দি ডেইলি স্টার*, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫।

ও অন্যান্য, ২০০১; আফসার, ২০০৯; সিদ্দিকী, ২০১২; বিআইএলএস, ২০১৪)। উল্লেখ্য, এসব সমস্যার বেশিরভাগের উৎস অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া এ খাতে সুশাসনের দুর্বলতার কারণেও অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন খাতে অভিবাসন প্রক্রিয়া, ব্যয় ধরন, অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতির ওপর গবেষণা থাকলেও অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, আইনি কাঠামো ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও শ্রমের অভিবাসন খাতে অভিবাসন-পূর্ব ও অভিবাসন-পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। এ খাতে এখনো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় নি (রামরু, ২০১৬)।

অভিবাসনে সুশাসনের ফলাফল সকলের জন্য ইতিবাচক করা এবং অভিবাসীর অধিকারকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৯] এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ৮-১২ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত অভিবাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক বৈশ্বিক ফোরাম-এর (Global Forum on Migration and Development) নবম সম্মেলনে শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন এবং নিয়োগে নৈতিকতা (এথিকাল রিক্রুটমেন্ট) ছিল অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনের আলোচনায় সারাবিশ্ব জুড়ে নিয়োগ (রিক্রুটমেন্ট) ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হওয়া, অভিবাসনের দেশে অভিবাসীদের প্রতারণার মুখে পড়া এবং একইভাবে নিজ দেশেও প্রতারিত হওয়ার উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে নীতি ও আইন তৈরি করলেও প্রতারণা কমানো যায় নি।[২০] এছাড়া জিএফএমডি'কে ঘিরে অনুষ্ঠিত 'অভিবাসন, উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন'-এ আলোচিত বিষয়ের মধ্যে শ্রম অভিবাসন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ছিল উল্লেখযোগ্য। 'পিজিএ'-তে গৃহীত সুপারিশের মধ্যেও শ্রম অভিবাসীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২১] এছাড়া সরকারসহ বিভিন্ন অংশীজনের বক্তব্যে শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা উঠে এসেছে।[২২]

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও উদঘাটন করা হয়েছে।[২৩] এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের অপর্যাপ্ততা ঝুঁকিপূর্ণ অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচারকে উৎসাহিত করে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে (পারভেজ ও অন্যান্য, ২০১৬; ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৬; রশিদ ও আশরাফ, ২০১৫; আইওএম, ২০১৫; ম্যাকিনসলে গ্লোবাল ইন্সটিটিউট, ২০১৬)।

শ্রম অভিবাসন খাতে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান, রেমিটেন্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় এই বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, তাদের মধ্যকার সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
৩. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

---

[১৯] টার্গেট ৮.৭, ৮.৮, ১০.৭, ১০ সি এবং ১৭.৮ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

[২০] রামরু, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

[২১] রামরু, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

[২২] শেখ হাসিনা, 'বৈশ্বিক সমঝোতা: অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে', *প্রথম আলো,* ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬; 'বৈশ্বিক অভিবাসন নিয়ে জনবক্তৃতা: অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ঠিক করার তাগিদ সুইডিশ মন্ত্রী', *প্রথম আলো,* ১২ মে ২০১৬।

[২৩] দেখুন সি আর আবরার, 'কনসেকোয়েন্স অব নন-ট্রান্সপারেন্সি', *ডেইলি স্টার,* ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; রেফায়েত উল্লাহ মৃধা, '৭৫ পার্সেন্ট অব মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স রিসিভড লোয়ার ওয়েজেস দ্যান প্রমিজড', *ডেইলি স্টার,* ৮ ডিসেম্বর ২০১৬; পরিমল পালমা, 'ওয়ার্কার মাইগ্রেশন টু এমই, মালয়েশিয়া: ওভারসীজ টাউটস জ্যাক আপ কস্টস', *ডেইলি স্টার,* ১১ ডিসেম্বর ২০১৬; সৈয়দ মনসুর হাশেম, 'হোয়াই মাস্ট উই পে মোর?,' *ডেইলি স্টার,* ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬; আহমেদ দীপ্ত, 'বিদেশ পাঠানোর কথা বলে ২১ লাখ টাকা নিয়ে উধাও', *প্রথম আলো,* ৫ ডিসেম্বর ২০১৬; 'চাহিদাপত্র কেনা-বেচার কারণে খরচ বাড়ে', *প্রথম আলো,* ২ ডিসেম্বর ২০১৬; 'লুণ্ঠনের খপ্পরে জনশক্তি রপ্তানি', *প্রথম আলো,* ১৮ অক্টোবর ২০১৬।

১.৫ গবেষণার আওতা

এ গবেষণায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত তা নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন - কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের বাইরে কাজ নিয়ে যাওয়া।

২. আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সুশাসন কাঠামো পর্যালোচনা করা। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি, সরকার ও বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা।

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া, ভ্যালু চেইন, এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম, এসব অনিয়মের কারণ।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরা (বিএমইটি)-এর কর্মকর্তা, দেশী ও বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট, রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন (বায়রা) ও উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের সংগঠন (গামকা) প্রতিনিধি, সাব-এজেন্ট বা দালাল, বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, এবং গণমাধ্যম/সংবাদকর্মীদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিবাসী কর্মী ও অভিবাসন-প্রত্যাশী কর্মীদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা, প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও দলিল, এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে গবেষণার ফলাফল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এসব মতামতের ওপর ওপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো তথ্য আবার যাচাই করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণা জরিপ-নির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় বা সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, তবে এ খাতে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিক নির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে।

১.৭ গবেষণার সময়

২০১৬ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো

এ প্রতিবেদন পাঁচটি অ্যধায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও আওতা, গবেষণার পদ্ধতি ও সময় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জের কারণ ও প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসনের ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় আইন ও বিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমের অভিবাসন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার আগে এ খাতের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

২.১.১ বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুসমর্থিত শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বৈশ্বিক সনদ/ দলিল

বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণায় অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ ধরনের দশটি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বা অনুসমর্থন দিয়েছে। নিচে এসব আন্তর্জাতিক দলিল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০ (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - ICRMW, 1990)

অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল হচ্ছে এই সনদ। ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ' গৃহীত হয়, যা ২০০৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।[২৪] এই কনভেনশনে জাতিসংঘের অন্যান্য মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ, যেমন 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন' ও 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কভেন্যান্টে' বিধৃত মানবাধিকার, এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন কনভেনশন (কনভেনশন নং ৯৭, ১৪৩) ও সুপারিশ (নং ৮৬, ১৫১)-কে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসী কর্মীদের বিষয়ে আরও বিশদভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এই কনভেনশনে ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষর করে এবং ও ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এই কনভেনশন অবৈধ অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করে এবং একইসাথে অবৈধ অভিবাসনের শিকার অভিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলে। কনভেনশন অনুযায়ী যে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে বিদেশে চাকরির জন্য সচেষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতে হবে।[২৫] দেশত্যাগের আগেই গন্তব্য দেশে প্রবেশ, বসবাস, ও কর্মসংস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।[২৬] এই কনভেনশন অভিবাসী ও তার পরিবারের চিন্তা, মতামত প্রকাশ ও ধর্মপালনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।[২৭] এছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক অভিবাসী ও তার পরিবারের যে কোনো নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।[২৮] এছাড়া অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সে দেশের সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিয়োগ দানের মধ্যে সীমিত রাখা যেতে পারে বা সরকারি তত্ত্বাবধান ও অনুমোদনসাপেক্ষে এ কার্যক্রম বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থা, চাকরিদাতা ও তাদের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়া যেতে পারে।[২৯]

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউডিএইচআর), ১৯৪৮ (Universal Declaration of Human Rights - UDHR, 1948)

১৯৪৮ সালে গৃহীত এই ঘোষণায় সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির ভিত্তি। এই ঘোষণার অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়েছে সবার জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার সমান। কাউকে নিষ্ঠুর, অমানবিক শাস্তি না দেওয়ার কথাও বলা

---

[২৪] http://www.humanrights.ch/en/standards/un-treaties/migrant-workers/ (৩০ নভেম্বর ২০১৬)। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৪৮। তবে এ কনভেনশনে এখন পর্যন্ত পশ্চিমা কোনো শিল্পোন্নত দেশই স্বাক্ষর করে নি।

[২৫] *অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০*, অনুচ্ছেদ ৮।

[২৬] *অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০*, অনুচ্ছেদ ৩৭।

[২৭] *অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০*, অনুচ্ছেদ ১২, ১৩।

[২৮] *অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০*, অনুচ্ছেদ ১৬।

[২৯] *অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০*, অনুচ্ছেদ ৬৫-৬৬।

হয়েছে এই ঘোষণায়।[৩০] এতে আরও বলা হয়েছে যে আইনের চোখে সবাই সমান এবং যে কোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অধিকার সবার সমান।[৩১] এই ঘোষণা অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রের সীমারেখায় যে কোনো স্থানে সবার গতিবিধির স্বাধীনতা রয়েছে,[৩২] এবং যে কোনো ব্যক্তির নিজের দেশসহ যে কোনো দেশ ত্যাগ করার ও প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।[৩৩] বাংলাদেশ এই ঘোষণাকে অনুসমর্থন করেছে।[৩৪]

নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ (সিডও), ১৯৭৯ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- CEDAW, 1979)

নারী অভিবাসী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দুই দেশকেই নারী অভিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও সহিংসতা দূরীকরণে জবাবদিহিতার আওতায় এনে ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় 'নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ'। সনদটিতে নারী পাচার, জোরপূর্বক যৌন-কর্মী হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া,[৩৫] এবং নারীদের কর্মসংস্থান ও নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য রোধের কথা বলা হয়েছে।[৩৬] বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে শরীয়া আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণ দেখিয়ে অনুচ্ছেদ ২, ১৩(ক) ও ১৬ (১) (গ, চ) এর ক্ষেত্রে আপত্তি রেখে এই সনদ অনুসমর্থন করেছে।[৩৭]

২.১.২ বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি ও আইন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬

বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালে প্রথমবারের মতো 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন করে। তবে পরবর্তীতে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'-পরবর্তী সময়, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি, সরকার কর্তৃক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন এবং জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের 'অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ'-এর অনুসমর্থন বিবেচনা করে মূল প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ন রেখে আগের নীতিকে রহিত করে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়।

বর্তমান নীতির প্রধান লক্ষ্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের মাধ্যমে স্বনির্বাচিত বৈদেশিক কর্মসংস্থান উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ধারা ২(৩)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও দীর্ঘমেয়াদে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের স্থায়ী অভিবাসী জনগোষ্ঠী[৩৮] (Diaspora), উভয়ই 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬'-এর আওতাধীন। এই নীতির ছয়টি নীতি-উদ্দেশ্য রয়েছে:

১. স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার-বলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগ পেতে আগ্রহী নারী ও পুরুষের জন্যে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড ও আইনি দলিলের সাথে সংগতি বজায় রেখে দেশীয় আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগের মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা প্রদান করা।
৩. অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার সব স্তরে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণমূলক সেবা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড এবং জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ও নারী বৈষম্যবিরোধী কিংবা নারী কর্মীদের সুরক্ষা বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি দলিলের সাথে সংগতি রেখে এবং নিরাপদ ও শোভন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় জেন্ডার-সমতা (Gender equality) নিশ্চিত করা।
৫. শ্রম অভিবাসন নীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রম বিষয়ক জাতীয় নীতিসমূহের মধ্যে অধিকতর সংগতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা।

---

[৩০] *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮*, অনুচ্ছেদ ৫।

[৩১] *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮*, অনুচ্ছেদ ৭।

[৩২] *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮*, অনুচ্ছেদ ১৩-১।

[৩৩] *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮*, অনুচ্ছেদ ১৩-২।

[৩৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf (৩০ নভেম্বর ২০১৬)।

[৩৫] *নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯*, অনুচ্ছেদ ৫, ৬।

[৩৬] *নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯*, অনুচ্ছেদ ৩, ৯, ১১।

[৩৭] *দৈনিক প্রথম আলো,* 'সিডওর দুটি ধারা থেকে আপত্তি তুলবে না সরকার', ১২ ডিসেম্বর ২০১৬।

[৩৮] অন্যদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তবে নিজ দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছেন, এমন দীর্ঘমেয়াদে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের স্থায়ী অভিবাসী জনগোষ্ঠী।

৬. শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার জন্যে একটি দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো (Labour migraton governance) প্রবর্তন করা।

এই নীতিতে যেসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন, অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা, অভিবাসী কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক সেবা, নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন, জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ. এবং শ্রম অভিবাসন পরিচালনা। পরবর্তীতে এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। এছাড়া শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১

'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' শ্রম অভিবাসনের সাথে সম্পর্কিত একটি সম্পূরক নীতিমালা। এই নীতিমালায় শ্রম অভিবাসীদের সর্বাঙ্গীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে নিরাপদ অভিবাসন ও জীবিকায়নের জন্যে 'অভিবাসন সহায়তা সেবা' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি নিরাপদ ও ন্যায়সংগত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের অভিবাসী কর্মী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের সাথে সংগতি স্থাপন করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'বহির্গমন অধ্যাদেশ, ১৯৮২' রহিত করে ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে অভিবাসী শ্রমিকের সংজ্ঞায় কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং কাজে নিযুক্ত হয়ে বা না হয়ে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন এমন কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৩৯] এই আইনে অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য (প্রক্রিয়া, কর্মসংস্থান চুক্তি, বিদেশে কাজের পরিবেশ, আইনগত অধিকার), আইনগত সহায়তা, দেশে ফিরে আসা, এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৪০]

এই আইনে অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করা হয়েছে,[৪১] এবং বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোনো কাজ করতে পারবে না[৪২] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনে লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা, লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল ও প্রত্যাহার[৪৩] করার বিধি অন্তর্ভুক্ত, এবং রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব[৪৪] বর্ণিত হয়েছে।

এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে যে এই আইনে সংক্ষুব্ধ অভিবাসী কর্মীদের সরাসরি মামলা দায়েরের অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৪৫] আইনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মধ্যে অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী পাঠানো, অবৈধভাবে অর্থ আদায়, প্রতারণা, অনুমতি ছাড়া বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুপতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা কেনা-বেচা, বহির্গমন স্থান ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে বহির্গমনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য দণ্ডের বিধান রয়েছে।[৪৬] এই আইনের অপরাধের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটিতে অপরাধের ধরন অনুযায়ী অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য এবং অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে।[৪৭] এছাড়া এই আইনের অধীনে অপরাধ দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রবিশেষে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন বিচার্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে,[৪৮] এবং দায়েরকৃত মামলা সিআরপিসি অনুযায়ী চারমাস এবং এর মধ্যে সম্ভব না হলে আরও দুইমাসে নিষ্পন্ন করার বিধান রয়েছে।[৪৯]

---

[৩৯] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ২ (৩)।

[৪০] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ২৬-৩০।

[৪১] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩ (২)।

[৪২] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৯ (১)।

[৪৩] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ১০-১৩।

[৪৪] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ১৫।

[৪৫] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ২৮।

[৪৬] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩১-৩৫।

[৪৭] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩৯।

[৪৮] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩৮ (১)।

[৪৯] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩*, ধারা ৩৮ (২)।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, আলোচনা ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে আইনটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।

- এই আইনের মূল দুর্বলতা হচ্ছে এতে কেবল বৈধ ও নিয়মিত অভিবাসী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই আইনে কোনো উল্লেখ করা হয় নি।
- এই আইনের অনেক ধারা নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়। ফলে এটি আইনের শক্তিকে খর্ব করে। এছাড়া এই আইনে "অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন এই আইন অগ্রাধিকার পাবে" এমন কোনো ধারা নেই।[৫০]
- এই আইনে অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ থাকার ফলে এ খাতে সক্রিয় 'দালাল'দের কার্যক্রম স্বীকার করা হয় নি ও এ আইনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে পাঠানো সংক্রান্ত সব কার্যক্রম সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকবে[৫১] বলা হলেও কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে তা বলা নেই।
- এই আইনের ১৪ ধারা প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও ক্ষেত্রবিশেষে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচার সম্পন্ন করার অনুমতি দেয়, যা আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারাকে খর্ব করে যেহেতু এই দুটি ধারায় বর্ণিত শাস্তি মোবাইল কোর্টের আওতার বাইরে। যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩২ ধারা অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারেন। আইনটিকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট দুই বছরের বেশি কারাদণ্ড দিতে পারবে না।[৫২]
- মোবাইল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথমে আপিল করা যাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল করা যাবে জেলা ও দায়রা জজের কাছে। মোবাইল কোর্টের কোনো মামলা বিচার হয়ে জেলা ও দায়রা জজের কাছে খারিজ হয়ে গেলে এ বিষয়ে আর ফৌজদারি মামলা করার সুযোগ নেই। কারণ, বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(২) অনুচ্ছেদ ও ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৩ ধারা অনুযায়ী এক অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না।
- সরকারি কর্মকর্তা এবং বিশেষকরে শ্রম উইং-এ দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান এই আইনে নেই।[৫৩]
- এছাড়া আইনটির ধারা-১৮ তে রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও তার বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী বহির্গমনের জন্যে নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোনো স্থান দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বহির্গমনের ব্যবস্থা করলে বা তাতে সহায়তা করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।[৫৪] এই ধারার মাধ্যমে মানব পাচারকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রণয়ন করে। আইনটিকে অন্যান্য আইনের সাপেক্ষে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মানব পাচার সংক্রান্ত বিচার 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' এর পরিবর্তে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২' এর অধীনে হবে।

এই আইনের ১৮ ধারায় অপরাধের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে কারও বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হলে প্রাথমিক অবস্থায় তাকে নিরপরাধ (presumption of innocence) বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনের অধীনে কোনো মামলা হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে অপরাধী (presumption of guilt) বলে ধরে নেয়া হবে। এছাড়া ধারা-৫ এর মাধ্যমে আইনটিকে অতিরাষ্ট্রিক প্রযোজ্যতা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক পাচারের শিকার হলে সেক্ষেত্রেও এই আইনটি প্রযোজ্য হবে।

---

[৫০] রামরু, *Ensuring Prosecution under the Overseas Employment and Migration Act 2013*, পলিসি ব্রিফ ২০, ২০১৬।

[৫১] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩ (১)।

[৫২] রামরু, *Ensuring Prosecution under the Overseas Employment and Migration Act 2013*, পলিসি ব্রিফ ২০, ২০১৬।

[৫৩] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ২০১৫ (http:/www.kalerkantho.com/print-edition/muktadhara/2015/11/01/285425)

[৫৪] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩৪।

শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিধিমালা

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর পাশাপাশি শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি হচ্ছে 'বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২', 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২', 'রিক্রুটিং এজেন্সী লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালা, ২০০২', 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসী বাংলাদেশী) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৫'[৫৫], 'রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা ২০০৮'[৫৬], এবং 'বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০০৮'[৫৭]। অভিবাসন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রম অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্টদের ভূমিকা এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এসব বিধি প্রণীত হয়েছিল।

তবে এই বিধিগুলোতে কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়, যেমন বহির্গমন বিধিমালায় ইমিগ্র্যান্ট রেজিস্ট্রার ও লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্যে কোনো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধ ও অনিয়মজনিত কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান এখানে নির্দিষ্ট করা হয় নি। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, ২০০২ সালের বিধিমালাই এখনো বিদ্যমান। ফলে এখনকার বাস্তবতায় এ খাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য মেডিকেল পরীক্ষার নীতি ২০০৮'-এ বিশেষকরে এইচআইভি-এইডস-এর মতো সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে 'অযোগ্য' ঘোষণা করার প্রক্রিয়া, কাউন্সেলিং, চিকিৎসা ও সেবা, এবং বহিষ্কারের ক্ষেত্রে তেমন কিছু বলা হয় নি।[৫৮]

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নীতি ও আইনে অভিবাসী কর্মীদের উৎস ও গন্তব্য দেশে বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এসব আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রম অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, এবং একইসাথে বেসরকারি কার্যক্রমেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার জন্যে একটি দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো প্রবর্তন করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমের অভিবাসন নিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান নীতি ও আইনের বিপরীতে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান তা নিচে আলোচনা করা হলো।

২.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কাঠামো

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন কাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে রয়েছে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যদিকে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র। উল্লেখ্য, এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এ খাতে বেশ কয়েকটি অংশীজন রয়েছে যারা বাংলাদেশের আইনের আওতার বাইরে সক্রিয়, এবং ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী অংশে শ্রম অভিবাসন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশীজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[৫৫] এই নীতি প্রথম ২০০৬ সালে প্রণীত হয় যেখানে রেমিটেন্স প্রেরণকারী বাংলাদেশীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ১৫ জনকে সিআইপি মর্যাদা দেওয়া হতো। এই নীতি ২০১৫ সালের ৭ মে সংশোধন করা হয় এবং সর্বোচ্চ ৯০ জনকে তিনটি ভিন্ন শ্রেণিতে সিআইপি মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন নীতি অনুযায়ী বিদেশে থাকা অবস্থায় কমপক্ষে তিনলাখ ডলার বিনিয়োগ করলে এই মর্যাদা পাবেন, যা আগে ছিল কমপক্ষে পাঁচলাখ ডলার। এবং রেমিট্যান্স প্রদানকারীর শ্রেণিতে একটি অর্থবছরে কমপক্ষে দুইলাখ ডলার পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

http://archive.dhakatribune.com/business/2015/may/14/conditions-eased-nrbs-avail-cip-card-quota-raised#sthash.7pQTryv5.dpuf (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৫৬] নির্দিষ্ট পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠানোর প্রেক্ষিতে অভিবাসী কর্মীদের বিশেষ সুবিধা যেমন অভিবাসীদের সন্তানদের শিক্ষার সুবিধা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আবাসন প্রকল্পে অগ্রাধিকার, সরকারি হাসপাতালে অগ্রাধিকার, সরকারি পরিবহন খাতে সিটের অগ্রাধিকার, বিমানবন্দরে বিশেষ লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি এই নীতির মাধ্যমে দেওয়ার কথা। সূত্র: Abel Chikanda, Jonathan Crush, Margaret-Walton Roberts (eds), 2016, *Diasporas, Development and Governance*, IOM, Springer, Switzerland, p. 113.

[৫৭] এই নীতিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এই পরীক্ষার প্রতিবেদন 'গোপন' হিসেবে বিবেচনা করা এবং জনসমক্ষে প্রকাশ না করার কথা বলা হয়েছে (ধারা ৯ ই)। এই নীতি (বিশেষকরে এইচআইভি পরীক্ষার ক্ষেত্রে) অভিবাসী শ্রমিকের অধিকারের চেয়ে গন্তব্য দেশে বিতর্ক এড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার মানের ওপর বেশি জোর দেয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন OKUP (Ovibashi Karmi Unnayan Program), *Policy Review: Mandatory Health Test of Migrant Workers* । http://okup.org.bd/wp-content/uploads/2016/11/Mandatory-Health-Test-of-Migrant-Workers.pdf (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৫৮] OKUP (Ovibashi Karmi Unnayan Program), *Policy Review: Mandatory Health Test of Migrant Workers* । http://okup.org.bd/wp-content/uploads/2016/11/Mandatory-Health-Test-of-Migrant-Workers.pdf (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন কাঠামো

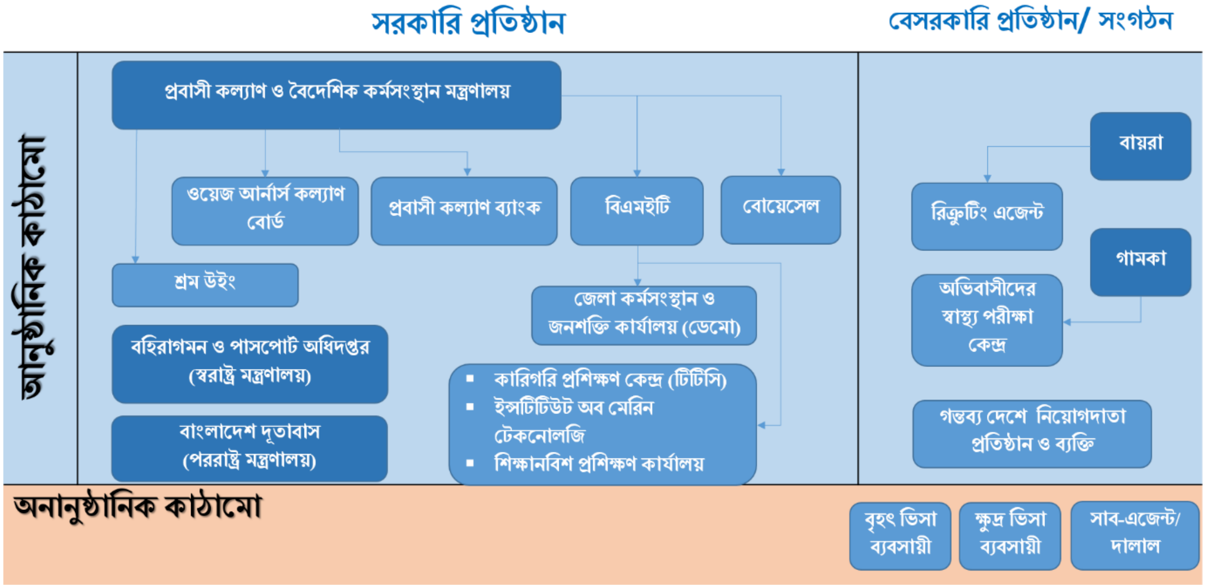

২.২.১ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কাঠামো: সরকারি প্রতিষ্ঠান

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করে। এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর[৫৯] মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/ সংশোধন।
- মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান।
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- অভিবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৪টি অনুবিভাগের অধীন ৯টি অধিশাখা, ২০টি শাখা ও ১টি শ্রমবাজার গবেষণা সেলের আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৩৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা মোট ৩৮ জন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল মোট ১০১ জন।[৬০] এছাড়া এ

[৫৯] http://www.probashi.gov.bd/site/page/69b716ae-5555-4eec-b003-73d2320c4d0a (৬ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৬০] এর মধ্যে বর্তমানে মন্ত্রীর নেতৃত্বে সচিব একজন, অতিরিক্ত সচিব দুইজন, যুগ্মসচিব আটজন, উপসচিব ১১ জন, উপপ্রধান দুইজন, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সচিবের একান্ত সচিব ১২ জন, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান একজন, সহকারী প্রোগ্রামার একজন ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা একজন কর্মরত। তথ্যসূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*।

মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে। শ্রম উইংসগুলোতে মোট জনবল ১৮২ জন।[৬১]

মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ-এর কার্যক্রমের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, যার মধ্যে রয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সির শর্ত লঙ্ঘন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম অনুসন্ধান; অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের তদারকি, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধ, অনিয়মের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ; অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা যেসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে করা হয় সেগুলো তদারকি; এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সাথে সমন্বয় করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় সচেতনতা সৃষ্টি, অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারণা পরিচালনা উল্লেখযোগ্য।[৬২]

মন্ত্রণালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উইং হচ্ছে বিদেশের মিশনে অবস্থিত শ্রম উইং, যা এসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা ২৮টি এবং মোট জনবল ১৮২ জন। যেসব দেশে শ্রম উইং রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (আবুধাবী, রিয়াদ, জেদ্দা), কুয়েত, কাতার, ওমান, লিবিয়া, বাহরাইন, আরব আমিরাত (দুবাই), মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরাক, ইতালি (রোম, মিলান), জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, মিশর, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, গ্রীস, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড (জেনেভা), দক্ষিণ আফ্রিকা ও হংকং।[৬৩]

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চারটি দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে: ১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); ২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল); ৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড; এবং ৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। নিচে এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) (Bureau of Manpower, Employment and Training-BMET): জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রলালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে বিএমইটি প্রতিষ্ঠা করে। ব্যুরোর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনশক্তি চাহিদার যোগান দেয়া ও জনশক্তি রপ্তানি করা। বিএমইটি'র সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম[৬৪] হচ্ছে:

১. বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের বৈদেশিক চাহিদা প্রক্রিয়া করা;
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্যে নিয়োগকৃত কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ন্ত্রণ করা;
৩. শ্রম অভিবাসনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
৫. বৈদেশিক শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রচার করা;
৬. গন্তব্যদেশে অভিবাসী বাংলাদেশীদের দেখাশোনা করা;
৭. কর্মহীন ব্যক্তিদের নিবন্ধন করা ও তাদের কর্মসংস্থান করা;
৮. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৯. উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
১০. অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
১১. শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা।

বিএমইটি'র চারটি উইং রয়েছে: ১) প্রশাসন উইং, ২) কর্মসংস্থান উইং, ৩) প্রশিক্ষণ উইং, এবং ৩) অভিবাসন ও প্রটোকল উইং।[৬৫] এছাড়া এর অধীনে ৪২ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় (ডেমো), ৪৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তিনটি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও তিনটি শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যালয় (Apprenticeship Training Office) রয়েছে।[৬৬] এছাড়া অভিবাসীদের ডাটাবেইজ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার কাজটিও বিএমইটি করে থাকে।

[৬১] এর মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৬ জন, তৃতীয় শ্রেণি ১২০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি একজন। তথ্যসূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৫।

[৬২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৭-৮।

[৬৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৯।

[৬৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.bmet.gov.bd/BMET/index (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৬৫] http://www.bmet.gov.bd/BMET/aboutAction (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৬৬] http://www.bmet.gov.bd/BMET/aboutAction (১১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

বিএমইটি'র ব্যবস্থাপনাজনিত একটি প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি অভিবাসীদের জন্যে জটিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক জটিলটায় আক্রান্ত (হক, ২০১৪)। সাধারণত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয় এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতায় ঘাটতি রয়েছে (সিদ্দিকী ও বিল্লাহ, ২০১২:৪)। এছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দে বিএমইটি'র ব্যর্থতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পাঠ্যসূচি হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন না করা ও জেলা জনশক্তি কার্যালয়সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ভূমিকার অভিযোগ পাওয়া যায় (পারভেজ ও অন্যান্য, ২০১৬)।

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড - বোয়েসেল (Bangladesh Overseas Employment and Services Limited- BOESL): অভিবাসনের জন্যে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন রিক্রুটিং এজেন্সী বোয়েসেল-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৮৪ সালে। বোয়েসেল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সঠিক কাজের জন্যে সঠিক কর্মী নিয়োগে বিদেশী নিয়োগকর্তাকে সহায়তা প্রদান, পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সেবা প্রদান ও অভিবাসন ব্যয় হ্রাস। বোয়েসেল না-লাভ না-ক্ষতি নীতিতে সেবা প্রদান করে থাকে। স্বচ্ছতা ও নিরাপদ অভিবাসনের নিমিত্তে বেসরকারী রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের মধ্যে সুস্থ ও পেশাগত প্রতিযোগিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে অভিবাসনে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।[৬৭]

বোয়েসেল এর প্রধান কার্যক্রম[৬৮] হচ্ছে:

১. আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার নিয়ম অনুসরণ করে স্বল্প ব্যয়ে গন্তব্য দেশগুলোতে অভিবাসী কর্মী পাঠানো;

২. সঠিক কাজের জন্যে সঠিক কর্মী নিয়োগে বিদেশী নিয়োগকর্তাকে সহায়তা প্রদান;

৩. দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা;

৪. জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আয় করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

৫. নারী ও দরিদ্র জনশক্তির জন্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং

৬. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্যে নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্যে প্রচেষ্টা।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত ২৭টি দেশে সর্বমোট ৬৪,১৯৩ জন কর্মী বোয়েসেল-এর মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।[৬৯] উল্লেখ্য, বোয়েসেল-এর মাধ্যমে বিদেশে গমনকারী কর্মীদের বড় অংশ হচ্ছে দক্ষ (প্রায় ৬৫.৩১%) ও আধা-দক্ষ (২৮.৯৫%)। তবে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের খুব সামান্য অংশই (০.৬২%) বোয়োসেল-এর মাধ্যমে গিয়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়, পরবর্তীকালে যা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে এই তহবিল পরিচালিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএমইটি এবং বায়রার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ বোর্ড গঠিত হয়েছে।

প্রত্যেক অভিবাসী কর্মী বাধ্যতামূলকভাবে সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, যা দ্বারা সরকার কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে।[৭০] অভিবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারকে এ তহবিল হতে সহায়তা দেওয়া হয়।[৭১] এ বোর্ডের উদ্দেশ্য[৭২] প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তাসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন করা, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সামাজিক

[৬৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.boesl.org.bd/ (১২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৬৮] http://www.boesl.org.bd/Activities.aspx (১২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৬৯] বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইট ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হিসাব অনুযায়ী। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.boesl.org.bd/UploadedDocument/NoticeboaedAttachments/541.pdf (১২ ডিসেম্বর ২০১৬), এবং *বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*।

[৭০] *অভিবাসী অধ্যাদেশ ১৯৮২* এর ধারা ১৯ (১) এবং *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩* এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী।

[৭১] http://www.wewb.gov.bd/site/page/41931875-0d57-42f1-a51c-b9f8a1a4c3dd/ (১৯ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৭২] http://www.wewb.gov.bd/site/page/5ad0db13-594c-430a-8f4a-261175ce03c9/ (১৯ ডিসেম্বর ২০১৬)।

পুনঃএকত্রীকরণের আওতায় আনা, এবং প্রবাসী কর্মীর সন্তানের শিক্ষা অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন সেবার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন ও রীতিনীতি, ভাষা, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং দেওয়া, এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের নিরাপদ বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা দেওয়া।[৭৩]

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৯৫ কোটি টাকার 'পেইড আপ ক্যাপিটাল' এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৫ কোটি টাকাসহ মোট ১০০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন হয় ২০১১ সালে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর কার্যক্রম হচ্ছে (১) কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীকে সল্প সুদে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান, (২) প্রবাস-ফেরত কর্মীকে স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, এবং (৩) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান করা। বর্তমানে সাতটি বিভাগীয় শহরসহ সারাদেশে এ ব্যাংকের ৫৪টি শাখা রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিদিন গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ওয়ান স্টপ সেবার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি, স্মার্ট কার্ড ফি ও ফিঙ্গার প্রিন্ট ফি জমা দেওয়া সংক্রান্ত সেবা দিচ্ছে।[৭৪] ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ ব্যাংক ৭,৭৫৮ জন বিদেশগামী কর্মীর মধ্যে মোট ৭৮.৮৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, এবং এই অর্থবছরে ৪৪.৯২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করে।[৭৫]

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের নাগরিকদের বিদেশে যাতায়াতে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় পাসপোর্ট অফিস রয়েছে, যেখান থেকে নতুন পাসপোর্ট প্রদান ও পুরানো পাসপোর্ট নবায়ন করা হয়। এছাড়া বিশ্বের ৬৫টি বাংলাদেশী মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান করা হচ্ছে।[৭৬]

২.২.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক কাঠামো: বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

রিক্রুটিং এজেন্সি ও তাদের সংগঠন (বায়রা) (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies-BAIRA)

আইন অনুযায়ী বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুমোদিত একটি মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সি বা কোম্পানি।[৭৭] বাংলাদেশ হতে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র সংগ্রহ, উক্ত চাহিদাপত্র অনুসারে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন, সংশ্লিষ্ট গন্তব্য দেশের দূতাবাস হতে তাদের ভিসা স্টাম্পিং এবং সবশেষে বাংলাদেশে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো হতে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দেশে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নের মূল দায়িত্ব বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ পালন করে থাকে। গত শতাব্দীর সত্তরের দেশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করত সরকার। ১৯৮১ সালে থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে এই কাজ ব্যক্তিমালিকানাধীন এজেন্সির হাতে চলে যায়। এসব এজেন্সি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে কাজ করে। এসব এজেন্সি নিজস্ব উদ্যোগে বিদেশে কাজের তথ্য ও চাহিদাপত্র জোগাড় করে। বিএমইটি'র কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পর বিদেশী নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী বিএমইটি'র ডাটাবেজ থেকে এজেন্সিগুলোর কর্মী সংগ্রহ করা এবং তারপর এসব কর্মীর অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা (সিদ্দিকী ২০০৯; পৃ ২৫)। আইন অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ রক্ষা, অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা, কর্মসংস্থান চুক্তি অনুযায়ী কাজে নিয়োগ ও বেতন ও অন্যান্য সুবিধা ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।[৭৮]

সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও অভিবাসীদের কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮৪ সালে রিক্রুটিং এজেন্টদের জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস' (বায়রা) প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়রার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে (১) প্রবাসে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সদস্য সংগঠনগুলোকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা, সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া, (২) প্রবাসে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংহতি সৃষ্টিতে

---

[৭৩] ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫*, পৃ. ১০।

[৭৪] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৪২।

[৭৫] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৪০।

[৭৬] তথ্যসূত্র: http://www.dip.gov.bd/site/page/3352e2a4-1657-4f65-8079-5a2456ed4511 (২২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৭৭] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩ (২), ৯।

[৭৮] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ১৫।

সহায়তা দেওয়া, (৩) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় আইন কানুন প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা ও সহায়তা দেওয়া, (৪) প্রবাসী শ্রমিকদের ও দেশে তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ নেওয়া, (৫) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের জন্যে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, (৬) দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং (৭) বিদেশে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক আহত বা নিহত হলে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ও নিহতের ক্ষেত্রে লাশ দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।[৭৯] ২০১৬-এর ডিসেম্বরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত এজেন্সির সংখ্যা ১,০৩৭টি, এবং অনুমোদন স্থগিত রয়েছে ৮৯টি এজেন্সির।[৮০]

জিসিসি[৮১] অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন (গামকা) (GCC Approved Medical Centre's Association - GAMCA)

মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্যে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গামকা। এসব দেশে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে গামকার সদস্য যে কোনো মেডিকেল চেকআপ সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। গামকার কার্যক্রমের মধ্যে (১) মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোর হেল্থ মিনিস্টার কাউন্সিল-এর নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী আগ্রহী অভিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদন; (২) সংগঠনের সদস্য মেডিকেল সেন্টারগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগী বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল মেডিকেল সেন্টারের সেবার মান সমুন্নত রাখা; এবং (৩) সদস্য মেডিকেল সেন্টারগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণে কোনো ব্যত্যয় বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে গামকা'র সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬।[৮২]

নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি/ স্পন্সর/ কফিল

অভিবাসী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা। মূলত তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতেই প্রবাসের শ্রমবাজারে অভিবাসী কর্মীর প্রবেশাধিকার ও কাজের সুযোগ ঘটে।

বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী গ্রহণ করা হয়, যা 'কাফালা' পদ্ধতি নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতাকে 'কফিল' বলা হয়। এক্ষেত্রে কফিল হিসেবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতাকে অবশ্যই উক্ত দেশে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা নাগরিক হতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সকল অভিবাসী কর্মী নির্দিষ্ট কোনো কফিলের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে। কাফালা পদ্ধতিতে একজন কফিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার বা তার প্রতিষ্ঠানের অধীনে চুক্তিবদ্ধ সকল অভিবাসী কর্মীর সকল ধরনের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। চুক্তি শেষে অভিবাসী কর্মীর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের দায়িত্বও কফিলের। অনেকক্ষেত্রে কফিল তার অধীন সকল অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট বা ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিজ দায়িত্বে রাখে। অন্যদিকে একজন অভিবাসী কর্মী শ্রমচুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই নির্দিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতার অধীনে কাজ করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগদাতা ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং এ ধরনের কাজে ধরা পড়লে অভিবাসী কর্মীকে জেল জরিমানাসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি কাতার কাফালা ব্যবস্থা বাতিল করেছে।[৮৩]

অন্যান্য গন্তব্য দেশেও, যেমন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বৈধ শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে কাফালা পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি প্রচলিত, যা 'স্পন্সরশিপ' নামে পরিচিত। শ্রম অভিবাসনের প্রাক্কালে যে নিয়োগদাতার চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে এবং যার সাথে সম্পাদিত কর্মচুক্তির মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী গন্তব্য দেশে যেয়ে থাকে তাকে 'স্পন্সর' বলা হয়।

২.২.৩ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অনানুষ্ঠানিক কাঠামো

শ্রম অভিবাসনের অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের মধ্যে রয়েছে দেশের বাইরে সক্রিয় বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট, বড় ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা এজেন্ট, এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাল। নিচে এদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

---

[৭৯] তথ্যসূত্র: http://www.baira.org.bd/index.php/aims-a-objectives (১৯ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৮০] তথ্যসূত্র: http://www.bmet.gov.bd/BMET/raHomeAction (১৯ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৮১] Cooperation Council for the Arab States of the Gulf যা সংক্ষেপে জিসিসি নামে পরিচিত। এটি আরব উপদ্বীপের বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়ে গঠিত একটি জোট। তথ্যসূত্র: https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Cooperation_Council (২২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৮২] তথ্যসূত্র http://www.gamcabd.org/index.php?cat_id=9 (২২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৮৩] *ডেইলি স্টার*, 'এন্ড অব 'কাফালা' রুলস: মাইগ্র্যান্ট রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস হেইল কাতারস ডিসিশন', ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬।

বিদেশী শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ রিক্রুটিং এজেন্ট

বাংলাদেশ হতে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ প্রায় সব দেশেই বিদেশী শ্রমিক বা অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্ট রয়েছে। এসব রিক্রুটিং এজেন্সি গন্তব্য দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের চাহিদা মোতাবেক প্রবাসী কর্মী সরবরাহ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী দেশগুলোর রিক্রুটিং এজেন্টদের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ করে চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী কর্মী সরবরাহ করে। অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য গন্তব্য দেশ বা কর্মী গ্রহণকারী দেশে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণসহ অন্যান্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার দায়িত্বও অনেকক্ষেত্রে এসব রিক্রুটিং এজেন্সি পালন করে। এসব কাজের বিনিময়ে অভিবাসী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হতে রিক্রুটিং এজেন্ট নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকে।

বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী/ সরবরাহকারী

বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে একশ্রেণির বাংলাদেশী এবং ভিনদেশী ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা অভিবাসী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি হতে গ্রুপ ভিসা ক্রয় করে এবং বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে প্রবাসী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি ও বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে ভালো যোগাযোগ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা এই ভিসা ব্যবসায় প্রধান বিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে। দুই দেশের শ্রম বাজারে বিদ্যমান লাভজনক এই ভিসা বাণিজ্যে এসব ব্যবসায়ী পাইকারি ভিসা ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করে। তারা অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশ হতে একসাথে অনেক ভিসা সংগ্রহ করে, আর বাংলাদেশের বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে।

ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী

প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের একাংশ একই প্রতিষ্ঠানে বা একই নিয়োগদাতার অধীনে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে কাজ করার সুবাদে নিয়োগদাতার সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠানে নতুন অভিবাসী কর্মীর প্রয়োজন হলে, নিয়োগদাতার সাথে তৈরী হওয়া ভালো সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে নিয়োগদাতাকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদা পত্র সংগ্রহ করে। সাধারণত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির বাসগৃহে স্বল্প সংখ্যক অভিবাসী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব চাহিদাপত্র তৈরি হয়, সেগুলোই সংশ্লিষ্ট নিয়োগদাতার অধীনে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের একাংশ সংগ্রহ করে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত এসব চাহিদাপত্র সাধারণত বাংলাদেশে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কারো কাছে বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি উদ্যোগে সংগ্রহ করা একক ভিসার সংখ্যাই বেশি। বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের মোট অভিবাসী কর্মীদের ৯০ শতাংশের বেশি এ ধরনের ভিসায় যায়। তবে এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত দলীয় ভিসা সংগ্রহ করা হয় না। এ ধরনের ভিসা ব্যবসায়ীকে ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা ভিসা সংগ্রহকারী বলা যেতে পারে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ভিসা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

সাব-এজেন্ট বা দালাল

বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্টসমূহ তাদের সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুসারে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য মধ্যস্থতাকারী বা দালালের ওপর নির্ভরশীল। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে রিক্রুটিং এজেন্সির সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মূলত ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরভিত্তিক; সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের শাখা কার্যালয় বা স্থানীয় প্রতিনিধি নেই। ফলে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দালাল বা মধ্যস্থতাকারীরা কাজ করে।

তবে এই মধ্যস্থতাকারী বা দালালের আবার শ্রেণিভেদ আছে। প্রথম পর্যায়ের সাব-এজেন্ট বা দালাল সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে কাজ করে। সাধারণত তাদের সাথে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের যোগাযোগ থাকে। তাদের আর্থিক সক্ষমতাও বেশি থাকে। ফলে তারা একসাথে একাধিক ভিসা কিনতে পারে। অন্যদিকে তাদের সাথে আরেক শ্রেণির দালালের যোগাযোগ থাকে যারা তৃণমূল পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রথম পর্যায়ের একজন দালালের সাথে একাধিক তৃণমূল পর্যায়ের দালালের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের মাধ্যমেই মূলত অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ বা ভিসা বিক্রি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের দালালদের নিজেদের ভেতরেও যোগাযোগ থাকে।

সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী

সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে কেন্দ্র করেই শ্রম অভিবাসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪.১৫%) স্বল্পদক্ষ বা আধা-দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশ গমন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব স্বল্প শিক্ষিত অভিবাসন প্রত্যাশীর পক্ষে ঢাকা ও

চট্টগ্রাম-কেন্দ্রিক রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ থাকে না। ভৌগোলিক দূরত্ব, রিক্রুটিং এজেন্সি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাব, অপরিচিত হওয়ার কারণে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আস্থাহীনতা প্রভৃতি কারণে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয় না। অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোও একাধিক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও আর্থিক লেনদেনের ঝামেলা এড়াতে অভিবাসী কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগে অনাগ্রহী থাকে। ফলে সম্ভাব্য আগ্রহী অভিবাসী কর্মী তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সামাজিক পরিচিতির সূত্র ধরে বিভিন্ন দালালের সাহায্য নিয়ে বিদেশ গমনের জন্য ভিসা সংগ্রহ করে। তাছাড়া অধিকাংশ অভিবাসন-প্রত্যাশী অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ খরচ একসাথে দিতে না পারায় কিস্তিতে দালালের কাছে জমা করতে থাকে। কিস্তিতে অর্থ জমা দিতে থাকায় সম্ভাব্য অভিবাসী সংশ্লিষ্ট দালালের ওপর ভিসার ধরন, গন্তব্য দেশ ও মোট খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এছাড়া দালাল সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর মেডিকেল চেকআপ, পাসপোর্ট তৈরি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে নাম নিবন্ধন ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ, রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে পাসপোর্টে ভিসা স্টাম্পিং ও ভ্রমনের টিকেট সংগ্রহ, কাজের চুক্তিপত্র সংগ্রহ- অর্থাৎ এই দীর্ঘ ও জটিল অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে অভিবাসন প্রত্যাশীকে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্নে সহায়তা ও কিস্তিতে ভিসার মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে এবং সামাজিক সম্পর্কে বিদ্যমান বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া নির্ভরশীলতার সুযোগ গ্রহণ করে অভিবাসন প্রত্যাশীর কাছে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে ভিসা বিক্রয় করে।

২.৩ সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪২টি জেলায় নিবন্ধন এবং ২৫টি জেলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বহির্গমন প্রদানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসী কর্মীর পরিবার ও স্বজনদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকেও দেওয়া শুরু হয়েছে।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[৮৪] বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ভিসা যাচাইয়ের সুবিধা রয়েছে, এবং মোবাইল থেকে যাচাই করার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বাহরাইন, আরব আমিরাত, কাতার ও সিংগাপুরের ক্ষেত্রে এই সুবিধা বিদ্যমান।

যেসব দেশে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল তাদের মধ্যে অনেক দেশে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগে নতুন করে শ্রম অভিবাসন শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ায় সরকার-সরকার (জিটুজি) প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী পাঠানোর উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যার ভিত্তিতে ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত ৬০ হাজার ৮৫৫ জন নারী কর্মী সৌদি আরবে গিয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে কর্মী গ্রহণের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।[৮৫]

বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিএমইটি'তে 'প্রবাসী নারীকর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল' (Complaint Management and Cell for Expatriate Female Workers) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন টেলিফোন চালু করা হয়েছে। এছাড়া অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে যা অনলাইনভিত্তিক ও ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতিতে করা যায়। অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইনের পাশাপাশি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।[৮৬]

উপরোক্ত উদ্যোগ ছাড়াও অভিবাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও এসব কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসনের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি পরিচালনার জন্য আইনি কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে গত শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে শ্রমের অভিবাসন শুরু হলেও এ খাতের নীতি প্রণীত হয়েছে এর

---

[৮৪] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১৯।

[৮৫] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১৬।

[৮৬] অভিযোগ জানানোর ওয়েবসাইট হচ্ছে: www.ovijogbmet.org.bd

প্রায় ৪০ বছর পর, এবং ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশ প্রণীত হলেও তা আইনে পরিণত করা হয়েছে অনেক পরে। এমনকি নতুন আইনের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালাও এখন পর্যন্ত প্রণীত হয় নি। দেশের অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ধারাবাহিক দাবির প্রেক্ষিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কেবল এই শতকের শুরুর দিকে আলাদা মন্ত্রণালয় তৈরি করা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে শ্রমের অভিবাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কতটুকু কার্যকর তা দেখার আগে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন একমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 'বোয়েসেল' বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশে সরকারের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের (Memorandum of Understanding) শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ করা হয় চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে 'জি-টু-জি' পদ্ধতিতে। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শ্রম অভিবাসনের হার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় শ্রম অভিবাসনের তুলনায় নগণ্য।[৮৭]

অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দেশ হতে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা, অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীসহ বিভিন্ন পক্ষ জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পক্ষের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার সূত্রে বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যস্বত্বভোগী পক্ষ জড়িত হয়। বিভিন্ন গন্তব্য দেশ হতে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পক্ষ হচ্ছে: (১) নিয়োগদাতা/ স্পন্সর/ কফিল, (২) গন্তব্য দেশে শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ রিক্রুটিং এজেন্সি, (৩) বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৪) ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৫) বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি, (৬) প্রথম পর্যায় ও তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় সাব-এজেন্ট বা দালাল, এবং (৭) সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী।

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এবং এসব ধাপে বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক দেশ হতে অন্য দেশে বৈধভাবে প্রবেশ করার জন্য গন্তব্য দেশের পক্ষ থেকে যে ছাড়পত্র বা প্রবেশ অনুমতি দেওয়া হয়, তাকেই ভিসা বলে। বৈধভাবে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে একজন অভিবাসী কর্মীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গন্তব্য দেশের ভিসা। সাধারণত পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে একজন অভিবাসী কর্মীকে সংশ্লিষ্ট দেশে প্রবেশ অনুমতির সাথে সাথে, উক্ত দেশে তার অবস্থানের উদ্দেশ্য ও মেয়াদ উল্লেখ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই ভিসা প্রক্রিয়াকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াটি সামগ্রিকভাবে মূলত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। <u>প্রথম পর্যায়ে</u> বিভিন্ন গন্তব্য দেশ হতে অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদাপত্র বা ভিসা সংগ্রহ করা হয়, <u>দ্বিতীয় পর্যায়ে</u> সংগৃহীত সেই ভিসা বাংলাদেশে আগ্রহী সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের কাছে বিক্রি নিশ্চিত করা হয়, এবং <u>তৃতীয় পর্যায়ে</u> বাংলাদেশে বিভিন্ন ধাপে সেই ভিসা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীদের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী অংশে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং প্রত্যেক ধাপে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৩.১ গন্তব্য দেশে কার্যাদেশ/ চাহিদাপত্র সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ হতে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ। গন্তব্য দেশে সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা কর্তৃক অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদাপত্র প্রস্তুত করার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে নিয়োগদাতা তার প্রয়োজন ও কর্মী নিয়োগের সক্ষমতা অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদাপত্র তৈরি করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়মানুযায়ী চেম্বার অব কমার্স, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সত্যায়ন ও অভিবাসী কর্মী নিয়োগের অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে চাহিদাপত্র তৈরি সম্পন্ন হয়।

---

[৮৭] উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে মোট শ্রম অভিবাসীর মাত্র ০.৩১ শতাংশ সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ৯৯.৬৯ শতাংশ প্রবাসী শ্রমিক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ গমন করেছে। সূত্র: বোয়েসল ওয়েবসাইট, http://www.boesl.org.bd/UploadedDocument/NoticeboaedAttachments/541.pdf (১২ ডিসেম্বর ২০১৬)।

চিত্র ৪: ভিসা সংগ্রহ ও ভিসা বিক্রির বিভিন্ন ধাপ

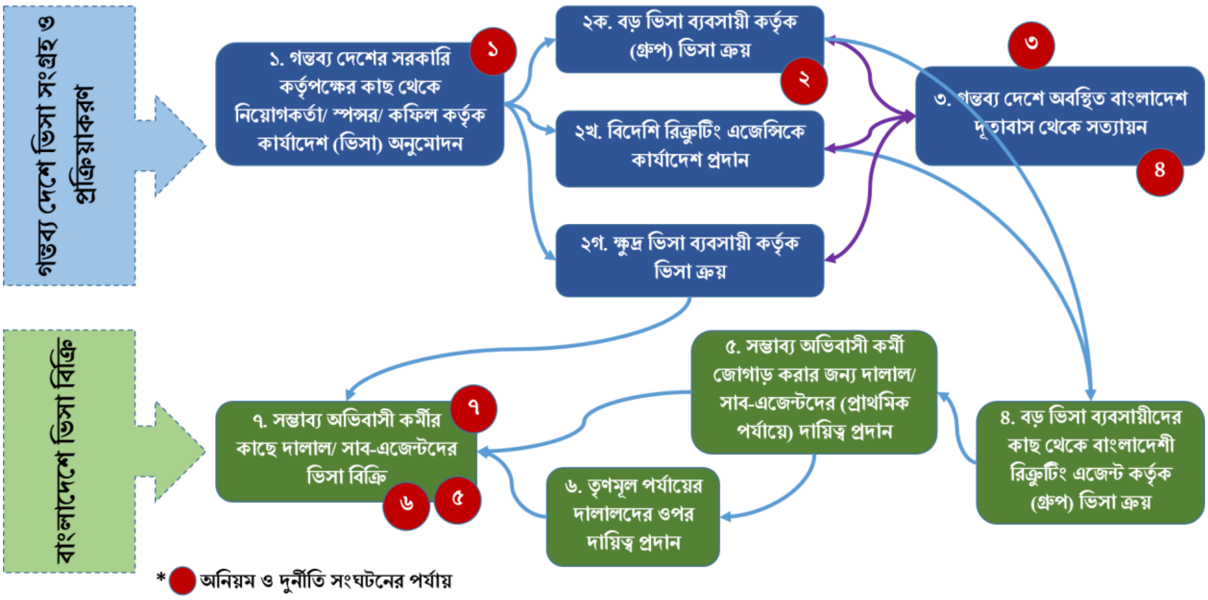

আইনানুযায়ী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা গন্তব্য দেশের কোনো অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য চাহিদাপত্র ও কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। একইভাবে গন্তব্য দেশের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, যারা সেদেশের আইন অনুযায়ী নিজ গৃহে গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাচক, মালি, ড্রাইভার বিভিন্ন পদে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ দিতে সক্ষম, তারা স্পন্সর বা কফিল হিসেবে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে এবং তা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। অনেকক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ভিসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে এবং পরবর্তীতে তা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি নিয়োগদাতার উদ্যোগে প্রক্রিয়াজাত এসব অতিরিক্ত ভিসা বাংলাদেশে ‘ফ্রি’ ভিসা হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশে ‘ফ্রি’ ভিসা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ‘ফ্রি’ ভিসার চাহিদা অন্যান্য কন্ট্রাক্ট ভিসা অপেক্ষা বেশি, এবং এই ভিসার জন্য বিক্রয়মূল্যও বেশি পাওয়া যায়। ‘ফ্রি’ ভিসার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের কফিল বা স্পন্সর সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে ভিসা দিয়ে শ্রম অভিবাসনে সহায়তা করে, তবে কোনো কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। অভিবাসী কর্মীকে নিজ দায়িত্বে তার পছন্দমত কাজ খুঁজে নিতে হয়। কর্মী এক্ষেত্রে একাধিক কাজে যুক্ত হতে এবং অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে। তবে সৌদি আরবে ‘ফ্রি’ ভিসার জন্য কফিলকে মাসিক ৩০০ থেকে ৫০০ রিয়াল কাফালা ফি এবং বছর শেষে ‘আকামা’ নবায়ন করার জন্য আরও ৩০০ রিয়াল দিতে হয়। বিনিময়ে কফিল তার অধীনস্থ অভিবাসী কর্মীকে আইনি ও পুলিশি ঝামেলা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে, যেহেতু ‘ফ্রি’ ভিসা নামে প্রচলিত এই পদ্ধতিটি আইনত বৈধ নয়। সাধারণত যেসব অভিবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট গন্তব্য দেশে কাজ করছে, তারাই ‘ফ্রি’ ভিসায় যেতে বেশি আগ্রহী হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশে অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাহিদাপত্র অনুয়ায়ী অভিবাসী কর্মী সরবরাহের কার্যাদেশ কিনে নেয়। কিছুক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির পরিবর্তে গন্তব্য দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীরাও এই কার্যাদেশ অতিরিক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে থাকে। এই কার্যাদেশের সাথে চাহিদাপত্রের অনুলিপি, নিয়োগকারীর পক্ষে অভিবাসী কর্মী রিক্রুট করার অধিকার বা ক্ষমতাপত্র বা ‘ওকালা’ দেওয়া হয়।

গত শতকের আশির দশকে প্রথম যখন সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী কর্মী গ্রহণ করা শুরু করে তখন কোনো দেশের ভিসা কিনতে হতো না। উপরন্তু অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশের নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান যাতায়াতের টিকেটসহ যাবতীয় অভিবাসন ব্যয় বহন করতো। একইসাথে অভিবাসী কর্মী নিয়োগে সহায়তার কারণে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোও নিয়োগদাতার কাছ থেকে কর্মী-প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিশন পেতো। এমনকি বর্তমানেও ফিলিপাইনের অভিবাসী কর্মীদের ভিসা কিনতে হয় না, উপরন্তু সৌদি নিয়োগকর্তা আগ্রহী কর্মীর অভিবাসন খরচ বহন করে যা ন্যূনতম ৩,৭৫০ রিয়াল প্রদান করে।

অথচ বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে বর্তমানে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি ও অন্যান্য ভিসা ব্যবসায়ী গন্তব্য দেশে নিয়োগকারী কর্তৃক প্রদেয় অভিবাসী কর্মী-প্রতি প্রযোজ্য লেভি পরিশোধসহ উচ্চমূল্যে নিয়োগদাতার কাছ থেকে ভিসা ক্রয় করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি ও ভিসা ব্যবসায়ীদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদেরকে সবচেয়ে বেশি মূল্যে ভিসা ক্রয় করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, নেপাল, ভারত ও পাকিস্তানের অভিবাসী কর্মীদের সৌদি ভিসার জন্য ন্যূনতম ৮০০ হতে সর্বোচ্চ ৫,০০০ রিয়াল খরচ করতে হয়। অথচ বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে একই ভিসা ন্যূনতম ৭,০০০ হতে সর্বোচ্চ ২০,০০০ রিয়াল দিয়ে কিনতে হয়। সৌদি আরবে কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত খরচ এক লাখ ৬৫ হাজার টাকা, অথচ একজন অভিবাসী কর্মীকে এক্ষেত্রে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ হতে সর্বোচ্চ ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যেতেও কমপক্ষে আড়াই লাখ টাকা হতে সর্বোচ্চ আট লাখ টাকা খরচ হয়ে থাকে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মীরা দুই-তিন মাস কাজ করে তাদের অভিবাসন খরচ উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের এই অভিবাসন খরচ তুলতে দীর্ঘ সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সময়ের মধ্যে তার ভিসার মেয়াদ ও কাজের চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যায়।

বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে কর্মরত অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মী অপেক্ষা বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কয়েকগুণ বেশি (আইএলও, ২০১৪)। আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার (আইওএম) তথ্য অনুযায়ীও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় হয় বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের। মূলত গন্তব্য দেশগুলো থেকে ভিসা ক্রয় করার ক্ষেত্রে এই অভিবাসন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয়।

সারণি ১: কর্মী প্রেরণকারী দেশভেদে সৌদি আরবের ভিসার বিক্রয়মূল্য

কর্মী প্রেরণকারী দেশ	**ভিসার ক্রয়মূল্য** (সৌদি রিয়াল)
ফিলিপাইন	ফ্রি টিকেটসহ অতিরিক্ত ৩৭৫০ রিয়াল কর্মীকে প্রদান করা হয়
নেপাল	৫০০ - ৮০০
ভারত	১০০০ – ১৫০০
পাকিস্তান	৩০০০ - ৫০০০
বাংলাদেশ	৭০০০ - ১৫,০০০

অভিবাসী কর্মী সরবরাহের চাহিদাপত্র সংগ্রহের পর সাধারণত গন্তব্য দেশে কার্যাদেশপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি বা ভিসা ব্যবসায়ী সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস বা হাইকমিশন থেকে চাহিদাপত্র যাচাই ও সত্যায়ন করিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে দাখিলকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী নিয়োগদাতা চুক্তি অনুযায়ী কর্মীদের বেতন-ভাতা, আহার বাসস্থান ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা নিয়মিতভাবে প্রদানে সক্ষম কিনা, কর্মীর জন্য ভিসা/ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, এবং সর্বোপরি, নিয়োগদাতা তার চাহিদাপত্রে উল্লিখিত সংখ্যক কর্মীর জন্য বিদেশ গমনের সাথে সাথে চাকরির ব্যবস্থা করতে সক্ষম কিনা - প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য যাচাই করে চাহিদাপত্র সত্যায়নপূর্বক বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন পাঠানোর নিয়ম রয়েছে।

ভিসা সংগ্রহ ও সত্যায়নে দুর্নীতি ও অনিয়ম

১. গন্তব্য দেশে অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি: বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রায় সকল গন্তব্য দেশেই নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে অথবা তাদের অগোচরে বিনামূল্যে সরবরাহ না করে চাহিদাপত্র বা ভিসা বিক্রি করে, যা আইনত সম্পূর্ণ অবৈধ। অনেকক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ভিসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে এবং পরবর্তীতে তা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে।[৮৮]

২. গন্তব্য দেশে ভিসা কেনার জন্য বাংলাদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার: বাংলাদেশ ও গন্তব্য দেশ উভয় দেশের আইন অনুযায়ী ভিসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিসা ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশি ভিসা ব্যাবসায়ীরা ভিসা কেনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে গন্তব্য দেশে পাচার করা হয়।

[৮৮] একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী সৌদি আরবে সরকার অনুমোদিত কর্মভিসার প্রায় ৭০ শতাংশ কালোবাজারে বিক্রি হয় (শাহ, ২০০৮)।

সারণি ২: বিভিন্ন গন্তব্য দেশে ভিসার ক্রয়মূল্য ও অভিবাসী কর্মীর নিকট বিক্রয়মূল্য (২০১৬ সালের উপাত্ত অনুযায়ী প্রাক্কলন)

ক্রম	দেশ	৯০% পুরুষ কর্মীর সংখ্যা (২০১৬)	ভিসার ন্যূনতম ক্রয়মূল্য	ভিসার ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য	মোট ক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	মোট বিক্রয়মূল্য (কোটি টাকা)
১	সৌদি আরব	৬৮,০৬৪	১,২০,০০০	৫,০০,০০০	৮১৭	৩,৪০৩
২	বাহরাইন	৬৪,৮৭৯	৭০,০০০	২,৫০,০০০	৪৫৪	১,৬২২
৩	ওমান	১,৫৭,৮১৫	৭০,০০০	২,৫০,০০০	১,১০৫	৩,৯৪৫
৪	কাতার	১,০৩,৫০১	১,২০,০০০	৩,৫০,০০০	১,২৪২	৩,৬২৩
৫	আরব আমিরাত	২,৬৮২	১,০০,০০০	২,৫০,০০০	২৭	৬৭
৬	মালয়েশিয়া	৩৬,০৮৭	১,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩৬১	১,২৬৩
৭	সিঙ্গাপুর	৪৯,১৬৩	২,৫০,০০০	৬,০০,০০০	১,২২৯	২,৯৫০
				মোট	৫,২৩৪	১৬,৮৭৩

** প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে মোট পুরুষ অভিবাসী কর্মীর ৯০% হিসাব করা হয়েছে।

২০১৬ সালে শ্রম অভিবাসনের উপাত্ত অনুযায়ী ঐ বছর যে সাতটি দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ অভিবাসী কর্মী গিয়েছেন তাদের ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল প্রাক্কলন করে দেখা যায় ভিসা কেনা বাবদ কমপক্ষে ৫,২৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যার পুরোটাই ঐসব দেশে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হয়েছে (সারণি ২)।[৮৯]

৩. চাহিদাপত্র অনুযায়ী নিয়োগদাতা সম্পর্কে তথ্য যাচাই না করেই সত্যায়ন: অনেকক্ষেত্রেই গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসের শ্রম উইং চাহিদাপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে যাচাই না করেই চাহিদাপত্র সত্যায়ন করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪. অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে চাহিদাপত্র সত্যায়ন: কোনো কোনো গন্তব্য দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসের বিপক্ষে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে চাহিদাপত্র সত্যায়ন এবং হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

৩.২ বাংলাদেশে ভিসা বিক্রি

গন্তব্য দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে চাহিদাপত্র সত্যায়নের পর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যায়ন ছাড়াই এসব চাহিদাপত্র বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে বিক্রি করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো গন্তব্য দেশের বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি বা অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের কাছ থেকে ভিসা সংগ্রহ করে। অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে প্রবাসী কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগাযোগ থাকে এবং নিজেরাই স্ব-উদ্যোগে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। একইভাবে এসব রিক্রুটিং এজেন্সি গন্তব্য দেশে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ভিসা ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও কর্মীর চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা ও ব্যবসায়িক যোগাযোগকে কাজে লাগায়। এছাড়া ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী অথবা কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের একাংশের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক (Individual) ভিসা প্রক্রিয়াকরণের কাজও রিক্রুটিং এজেন্সি করে থাকে।

বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি নির্দিষ্ট সংখ্যক দলীয় ভিসা সংগ্রহ বা ক্রয় করার পর তার নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রথম পর্যায়ের দালালকে ভিসার দেশ, ভিসার ধরন, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর যোগ্যতা এবং দালালদের জন্য প্রযোজ্য বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। এরপর একজন প্রথম পর্যায়ের দালাল নিজ আর্থিক সক্ষমতা ও নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে যতগুলো ভিসা কিনতে চায়, সে অনুসারে রিক্রুটিং এজেন্সিতে অগ্রিম জামানত দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিসা নিজের জন্য বরাদ্দ (বুকিং) নিয়ে রাখে। একইসাথে প্রথম পর্যায়ের দালাল তার নিজ নেটওয়ার্কের সকল তৃণমূল পর্যায়ের দালালের কাছে উল্লিখিত ভিসা সম্পর্কে সকল তথ্য এবং তৃণমূল পর্যায়ের দালালের জন্য তার নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। সবশেষে তৃণমূল পর্যায়ের দালাল তার নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদেরকে ভিসার সকল তথ্য ও বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ

[৮৯] তথ্যদাতাদের মতে ৯০ শতাংশের বেশি পুরুষ অভিবাসী কর্মী ভিসা বাণিজ্যের শিকার, এবং বাকি প্রায় ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে ভিসা কিনতে হয় না।

নিজেদের সংগ্রহ করা ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে ভিসা-প্রতি বিভিন্ন খরচ বাদে ব্যবসায়িক লাভ বাবদ ন্যূনতম ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে।

শ্রম অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল পর্যায়ের দালালরা সাধারণত সারাবছর ধরে নিজ এলাকায় সম্ভাব্য সব অভিবাসী কর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, শারীরিক ও আর্থিক যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে তাদেরকে নির্দিষ্ট ভিসা সংগ্রহ করার আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে কিস্তিতে অর্থ জমা নিতে থাকে। পরবর্তীতে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর পছন্দমত ভিসা সংগ্রহ হলে তাদের কাছ থেকে বাকি টাকা সংগ্রহ করে এবং তাদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যের তালিকা প্রথম পর্যায়ের দালালের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে ভিসা সংগ্রহ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতবদলের মাধ্যমে সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রির পর্যায়ে ভিসা প্রতি কয়েকদফা মূল্য সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে কয়েকগুণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে বিক্রয়মূল্যের সাথে সাধারণত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি, ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় সরকারি ফি, আয়কর ও নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়, এবং কর্মীর বিদেশ গমনের টিকেটের মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে (সারণি ৩)।

সারণি ৩: গন্তব্য দেশভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিসার বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা) - ২০১৬

দেশ	নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি	বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী	ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী**	বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি	দালাল (১ম পর্যায়)	দালাল (তৃণমূল পর্যায়)
সৌদি আরব	১.২ – ২.৮	১.৫ – ৩.২	২.০ – ৩.৭	১.২ – ২.৮	৪.০ – ৫.৫	৪.৫ – ৬.৫	৫.০ – ১২*
বাহরাইন	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
ওমান	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
কাতার	১.২ – ১.৫	১.৫ – ১.৭	১.৭ – ২.০	১.২ – ১.৫	২.২ – ৩.০	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০
আরব আমিরাত	১.০ - ১.৫	১.৩ - ১.৮	১.৫ - ১.৮	১.০ - ১.৫	২.৫ - ৩.৫	২.৮ - ৪.০	২.৫ - ৮.০
মালয়েশিয়া	১.০ – ১.৪	১.২ – ১.৫	১.৫ – ২.০	১.০ – ১.৪	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০	৩.৫ – ৬.৫
সিঙ্গাপুর	২.৫ – ৩.০	২.৮ – ৩.৮	৩.৫ – ৪.৫	২.৫ – ৩.০	৫.০ – ৬.০	৫.৫ – ৬.৫	৬.০ – ৮.০

* নভেম্বর ২০১৬ সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম অভিবাসন শুরু হওয়ার পর ভিসার মূল্য কমে আসছে।

** ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী সাধারণত সরাসরি নিয়োগদাতার কাছ থেকে ভিসা ক্রয় করে এবং অভিবাসী শ্রমিকের কাছে বিক্রি করে।

ভিসা ও কাজের ধরন, সুযোগ-সুবিধা, ওভারটাইম কাজের সুযোগ প্রভৃতিভেদে ভিসার মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, সৌদি আরবে বিভিন্ন কোম্পানিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ভিসার দাম বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি, অন্য দিকে কন্সট্রাকশন খাতে নির্মাণ শ্রমিকের ভিসার দাম বাংলাদেশে কম।

অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম

৫. অভিবাসী কর্মীর কাছে দালালদের ভিসা বিক্রি: সাধারণত দালালদের কাছ হতে ভিসা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী বিদেশে চাকরি সম্পর্কে সবকিছু সঠিকভাবে না জেনেই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আর্থিক লেনদেন করে থাকে। ভিসা নিশ্চিতের অনেক আগে থেকেই কিস্তিতে অর্থ জমা দেওয়ার কারণে এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নির্ভরশীলতার কারণে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী দালালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকে। বিদেশে চাকরি সম্পর্কে দালাল যেটুকু তথ্য সরবরাহ করে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে তাই বিশ্বাস করতে হয়। সাধারণত আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে বিদেশ গমনের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে যাওয়ার পর কাজের চুক্তি তার হাতে দেওয়া হয়।

৬. অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে ভিসার জন্য অতিরিক্ত মূল্য আদায়: দালাল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, তাদের কোন জবাবদিহিতার ক্ষেত্র বা সুযোগ থাকে না। ফলে অনেকক্ষেত্রেই দালালরা অভিবাসী কর্মীর সাথে আর্থিক প্রতারণা, দীর্ঘসময় ধরে ভিসার জন্য হয়রানি করে, এবং ভালো চাকরি বা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে।

৭. বিনামূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও নারী অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে ১০-১৫ হাজার টাকা আদায়: বর্তমানে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী ভিসায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নারী অভিবাসী প্রেরণ করার নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই দালালরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা,

বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ, ভালো শহরে পাঠানোসহ বিভিন্ন অজুহাতে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আদায় করে থাকে।

৩.৩ ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ

গন্তব্য দেশ হতে ভিসা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে হাতবদলের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রি নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধাপে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কর্মীর পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহ, কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা কর্মীর নামে পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নাম নিবন্ধন, এবং সবশেষে বিএমইটি হতে অনুমোদনের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ফ্লাইট টিকেট সংগ্রহের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী গন্তব্য দেশে গমন করে। নিম্নের চিত্রে একনজরে বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ৫: বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপ

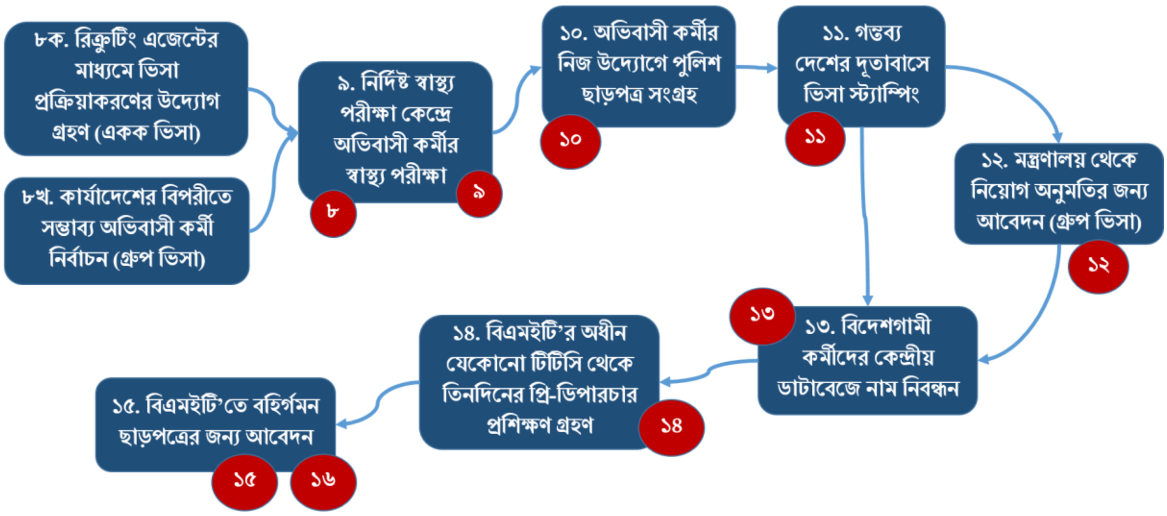

* অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের পর্যায়

সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন: দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপে কর্মী নির্বাচন করা হয়। আইনানুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাদেশ পাওয়ার পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনুমতি গ্রহণের পর বিএমইটি'র কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ হতে আগ্রহী কর্মী সংগ্রহ করবে। ডেটাবেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে।[৯০] তবে বর্তমানে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাধারণত ডাটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ না করে তাদের নিজস্ব দালাল-নির্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে।[৯১]

ডাটাবেজ হতে কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের চাহিদামতো ভিসার মূল্য সংগ্রহ করতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে অপরিচিত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে বিশ্বাস বা আস্থার সম্পর্ক না থাকায় ডাটাবেজে নিবন্ধিত অনেক আগ্রহী অভিবাসী কর্মী তাদের সাথে আর্থিক লেনদেনে আগ্রহী হয় না। এছাড়া কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে পছন্দের গন্তব্য দেশ ও কাজের খাতভিত্তিক আগ্রহী কর্মীর তালিকা না থাকায় সুনির্দিষ্ট কাজের ভিসার বিপরীতে আগ্রহী কর্মী নির্বাচন সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে, বিভিন্ন গন্তব্য দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করা একক ভিসার ক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপ হচ্ছে কোনো নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা এবং ভিসা প্রক্রিয়াকরণে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। কেননা দলীয় বা একক, উভয় ভিসার ক্ষেত্রেই বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিএমইটি'তে আবেদন করতে হয়, যদিও বিএমইটি'র নির্দেশনা অনুযায়ী একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মী নিজেই 'ওয়ান স্টপ' সেবার জন্য আবেদন করতে পারেন, এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে গমনকারী প্রায়

---

[৯০] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ১৯ (৩)।

[৯১] উল্লেখ্য, অভিবাসী কর্মীদের কত শতাংশ এই ডেটাবেজ থেকে বাছাই করা হয় তার কোনো তথ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।

শতভাগ অভিবাসী কর্মী তাদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নির্ভরশীল। এখানে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সিকে সরকার নির্ধারিত আয়কর ও বিভিন্ন ফি'র সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জও দিতে হয়।

বিদেশগামী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা: বাংলাদেশ হতে সামগ্রিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে অভিবাসী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা। প্রতিটি গন্তব্য দেশের জন্য সেই দেশের চাহিদা ও মান অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রম অভিবাসীদের গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের জিসিসি অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর সংগঠন হচ্ছে গামকা। এক্ষেত্রে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রথমে রিক্রুটিং এজেন্সি তার সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গামকা কার্যালয় হতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মেডিকেল স্লিপ সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে নির্বাচিত সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে গামকা নিবন্ধনের জন্য উক্ত মেডিকেল স্লিপ দিয়ে গামকা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। আগ্রহী অভিবাসী কর্মী এজেন্সি প্রদত্ত এই মেডিকেল স্লিপ নিয়ে গামকা কার্যালয়ে হাজির হয় এবং ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করে। গামকা কার্যালয়ে নিবন্ধনের জন্য ৩০০ টাকা ফি জমা দিতে হয়। এ পর্যায়ে গামকা কার্যালয় হতে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিবাসী কর্মী গামকা নিবন্ধন কার্ড নিয়ে তার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে যেয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি ৫,৮৫০ টাকা জমা দিতে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে এ সংক্রান্ত রশিদ বা স্লিপ নিয়ে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিতে জমা দিতে হয়, যা ব্যবহার করে এজেন্সি অনলাইনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সংগ্রহ করে।

পরবর্তীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের গন্তব্য দেশের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সত্যায়নের জন্য আবেদন করতে হয়। যেমন, সৌদি আরবের ক্ষেত্রে *https://enjazit.com.sa/* ওয়েবসাইটে অনলাইনে ভিসার জন্য এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সত্যায়নের জন্য আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রে সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি জমা দিতে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন ও ভিসা আবেদনপত্রের সকল তথ্য সঠিক হওয়া সাপেক্ষে প্রতিটি আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে একটি আবেদনপত্র নম্বর (MOFA Number) সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি কর্মীর পাসপোর্ট নম্বরের সাথে এই আবেদনপত্র নম্বরসহ একটি তালিকা পুনরায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে জমা দিতে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র সেই আবেদনপত্র নম্বর যাচাই সাপেক্ষে প্রত্যেক সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর জন্য পৃথক মেডিকেল কার্ড ইস্যু করে, যা রিক্রুটিং এজেন্সি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তবে গন্তব্য দেশভেদে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সত্যায়ন প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যেমন মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা নেই, এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন কোনো ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হয় না।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অনিয়ম

৮. সুস্থ ব্যক্তিকে আনফিট ঘোষণা করা ও টাকার বিনিময়ে ফিট বলে সনদ দেওয়া: কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিবাসী কর্মীর কাছে হতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মেডিক্যালি যোগ্য প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনে তাকে অযোগ্য ঘোষণার ভয় দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার অজুহাতে একই অভিবাসী কর্মীর একাধিকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোরও অভিযোগ পাওয়া যায়।

৯. সব পরীক্ষা না করেই ফিট সনদ দেওয়া: কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গন্তব্য দেশের দূতাবাসে ভিসা স্ট্যাম্পিং: নির্বাচিত অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে এ সংক্রান্ত মেডিকেল কার্ড সংগ্রহ করার পর গন্তব্য দেশের দূতাবাস হতে পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করাতে হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পৃথক ভিসা আবেদন ফাইল তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফাইলে সাধারণত যেসব নথি থাকা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে ভিসা আবেদনপত্র, পাসপোর্টের অনুলিপি, পুলিশ ছাড়পত্র, নিয়োগ চুক্তিপত্র, মেডিকেল কার্ড, এজেন্সির ভিসা ডেলিগেশন কপি ও সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের জন্য ফরোয়ার্ডিং লেটার। এক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মী ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জন্য পুলিশ ছাড়পত্র (Police Clearance Report) সংগ্রহ করে। দূতাবাসে জমা দেওয়া নথির সব তথ্য সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করা হয়। তথ্যগত অসম্পূর্ণতা বা ভুল পাওয়া গেলে ফাইল ফেরত দেওয়া হয়।

তবে কোনো কোনো গন্তব্য দেশ, যেমন ওমান, বাহরাইন ও কাতার হতে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীর নামে ছাপানো পেপার ভিসা পাঠানো হয়, ফলে পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

ভিসা স্ট্যাম্পিং-এ দুর্নীতি ও অনিয়ম

১০. পুলিশি ছাড়পত্র সংগ্রহে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়: পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিবাসী কর্মীর পক্ষ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে জানা যায়।

১১. ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি: কোনো কোনো গন্তব্য দেশের ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে হয়রানি এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশ ও ভিসার ধরনভেদে এই অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন হয়।

মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ অনুমতি, নাম নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ: গন্তব্য দেশের দূতাবাস হতে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশ হতে কর্মীর নামে ছাপানো পেপার ভিসা সংগ্রহের পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে একক ভিসা প্রক্রিয়াকরণে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর বিদেশগামী কর্মীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে ছবি ও বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারি ফি ২০০ টাকা। বর্তমানে ঢাকার বাইরে ২৫টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) হতে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন করার সুযোগ রয়েছে।

পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর অথবা পেপার ভিসা সংগ্রহ করার পর বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বিদেশ গমন সংক্রান্ত তিনদিনের একটি প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সনদ দেওয়া হয়, যা বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়।

বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ: আইন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে কাজের জন্য গমনকারী কর্মীদের বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র (Manpower Clearence) সংগ্রহ করতে হয়।[৯২] বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া দুই ধরনের - একক বহির্গমন ছাড়পত্র ও দলীয় বহির্গমন ছাড়পত্র। কোনো নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য একই দিনে একই কার্যাদেশ বা চাহিদাপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আটজন অভিবাসী কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হলে তা একক ভিসা হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে একই চাহিদাপত্রের মাধ্যমে একই দিনে একই নিয়োগদাতার অধীনে আটজনের বেশি কর্মীর জন্য আবেদন করলে তা দলীয় ভিসা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রে বিএমইটিতে আবেদনের পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগানুমতি নিতে হবে।

বিএমইটিতে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার পূর্বে কর্মী সংগ্রহের কার্যাদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নির্বাচন, নির্বাচিত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তাদের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন, প্রয়োজনীয় প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ এবং দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতি নিশ্চিত করতে হয়। পরবর্তীতে বিএমইটিতে আবেদনের ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশ অনুসারে বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট শাখায় কর্মীর সকল তথ্য/নথি সংবলিত ফাইল জমা দিতে হয়। একক ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য যেসব কাগজ-পত্র জমা দিতে হয় সেগুলো হচ্ছে:

১. বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির আবেদন পত্র/ ক্ষেত্র বিশেষে কর্মীর আবেদন
২. রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্সের বৈধতা সংক্রান্ত তথ্যাদি
৩. ভিসার কপি
৪. পাসপোর্টে ভিসার স্ট্যাম্পিং অনুলিপি
৫. কাজের চুক্তিপত্র
৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরবি অনুবাদকের মতামত
৭. প্রশিক্ষণের আসল সনদপত্র রিক্রুটিং এজেন্সির অঙ্গীকারনামা
৮. কর্মীর অঙ্গীকারনামা
৯. অভিবাবকের অনাপত্তিপত্র (নারী গৃহকর্মীর ক্ষেত্রে)
১০. ভিসা ও চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সত্যায়ন (গৃহকর্মীর ক্ষেত্রে)

[৯২] বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩, ধারা ১৯ ও ২০।

১১. বিভিন্ন সরকারি ফি প্রদানের তথ্য (আয় করের চালান, প্রবাসী কল্যাণ তহবিল ফি, স্মার্ট কার্ড ফি)
১২. ভিসার খরচ সরকার-নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে নয় মর্মে ঘোষণা পত্র।

দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মূল কার্যাদেশ, চাহিদাপত্র, ক্ষমতাপত্র, মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতি ও বিএমইটি'র নিয়োগানুমতিসহ একক ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরে উল্লিখিত সকল কাগজপত্র বিএমইটিতে জমা দিতে হয়। বিএমইটিতে ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের পূর্বে বিভিন্ন খাতে প্রযোজ্য বিভিন্ন ফি যে কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং আয়করের চালান বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় চালান ফরমের মাধ্যমে জমা দিতে হয়।

সারণি ৪: বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফি'র পরিমাণ

ক্রম	ফি'র বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ ফি (সকল দেশের জন্য)	৩৫০০
২	স্মার্ট কার্ড ফি	২৫০
৩	আয়কর চালান (একক ভিসার ক্ষেত্রে - সত্যায়িত)	২৫০
৪	আয়কর চালান (একক ভিসার ক্ষেত্রে - অসত্যায়িত)	৪০০
৫	আয়কর চালান (সৌদি আরব একক ভিসার ক্ষেত্রে - অসত্যায়িত)	৫০০
৬	আয়কর চালান (দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে – দক্ষ কর্মী)	১২০০
৭	আয়কর চালান (দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে – অদক্ষ কর্মী)	৮০০
৮	সত্যায়ন ফি (দলীয় অসত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে)	৮০
৯	ডাটাবেজে নিবন্ধন ও ফিঙ্গার প্রিন্ট ফি	২০০

বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীরা হয় নিজেই সব কাগজ-পত্রসহ আবেদন করতে পারে বা কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করতে পারে। তবে বাস্তবে এই 'ওয়ান স্টপ' সেবা তেমন কার্যকর নয় বলে দেখা যায়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে মাত্র ৩০৫ জন অভিবাসী কর্মী ওয়ান স্টপ সেবা নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীপ্রতি বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য পৃথক পৃথক ফাইল তৈরি করে। প্রতিটি ফাইলের ফরোয়ার্ডিং লেটারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্মীর গন্তব্য দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেকশনে ফাইল জমা দিতে হয়। আবেদন প্রাপ্তির পর কর্মীদের ভিসার সঠিকতা যাচাই, নিয়োগকর্তার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা যাচাই শেষে বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন করা হয়, এবং স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সেকশন ক্লার্ক, সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক কর্তৃক কয়েক দফায় যাচাই-বাছাই ও সত্যায়ন শেষে ফাইলটি অনুমোদনের জন্য পরিচালকের কাছে পাঠানো হয়।

চিত্র ৬: বিএমইটিতে বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া

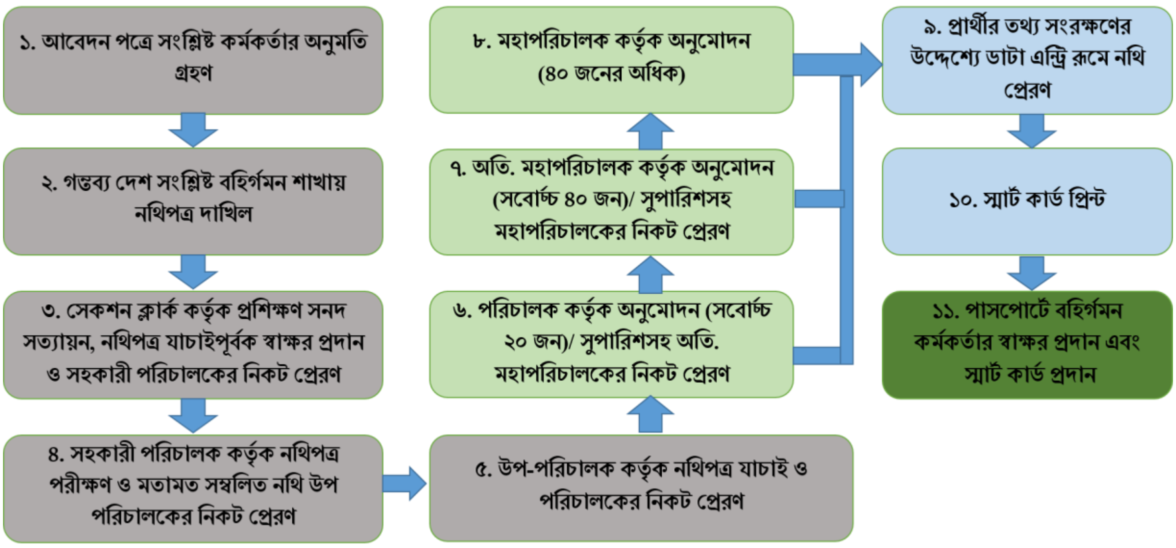

পরিচালক অনূর্ধ ২০ জনের জন্য ছাড়পত্রের অনুমোদন দিতে পারেন। ২০ জনের বেশি কর্মীর ছাড়পত্রের জন্য পরিচালক তার সুপারিশসহ ফাইলটি অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক সর্বোচ্চ ৪০ জনের জন্য ছাড়পত্রের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। ৪০ জনের বেশি কর্মীর ছাড়পত্রের জন্য অতিরিক্ত মহা-পরিচালক তার সুপারিশসহ মহা-পরিচালকের কাছে ফাইলটি প্রেরণ করেন। অনুমোদনের পর ফাইলটি পুনরায় সেকশন ক্লার্কের কাছে ফেরত যায়। সেকশন ক্লার্ক তখন ফাইলের সকল তথ্য কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ফাইলটি ডাটা এন্ট্রি রুমে প্রেরণ করেন। সকল তথ্য এন্ট্রি করার পর স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির প্রতিনিধি সকলের বহির্গমন ছাড়পত্র বা স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করে। সবশেষে কর্মীর পাসপোর্টে ছাড়পত্র নম্বরসহ বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর করাতে হয়। সাধারণত একদিনেই বিএমইটি হতে অভিবাসী কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা যায়।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণে দুর্নীত ও অনিয়ম

১২. মন্ত্রণালয় থেকে গ্রুপ ভিসার নিয়োগ-অনুমতির জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগানুমতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের একটি অসাধু চক্র ভিসাপ্রতি ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগানুমতি সংগ্রহ করার সময় এই নিয়ম-বহির্ভূত লেনদেন এড়ানোর জন্য অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি দলীয় ভিসার মোট সংখ্যাকে সর্বোচ্চ আটজনের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত (Split) করে ভিন্ন ভিন্ন দিনে আবেদন করে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

১৩. ডেটাবেজ থেকে নিবন্ধিত কর্মী বাছাই না করা: রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিএমইটি'র ডাটাবেজ থেকে নিবন্ধিত কর্মী বাছাই না করে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থাৎ দালালদের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করে। অথচ আইনে বলা হয়েছে যে প্রথমে বিএমইটি'র ডাটাবেজে নিবন্ধিত কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করতে হবে, আর তা না পাওয়া গেলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করতে হবে।[৯৩]

১৪. অর্থের বিনিময়ে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ সনদ সংগ্রহ: কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত না থেকে বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেও দালালদের সাথে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সনদপত্র সংগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৫. বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য ভিসা-প্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়: বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মী বা ভিসা প্রতি ন্যূনতম ১০০ টাকা হতে ২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৬. মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়া: ২০০৯ সাল হতে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কলিং ভিসায় বাংলাদেশ হতে স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে ২০১২ সালে দুই দেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে জি-টু-জি পদ্ধতিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় কর্মী পাঠানো শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রায় ১৫ লাখ আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নিবন্ধন করলেও দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ পায় মাত্র ১১ হাজার। বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী পরবর্তীতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সালে প্রায় ৩০ হাজার এবং ২০১৬ সালে প্রায় ৪০ হাজার অভিবাসী কর্মী বিভিন্ন ভিসায় বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে মালয়েশিয়ায় গিয়েছে। এক্ষেত্রে পেশাগত কর্মীর ভিসায় স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন, সংশ্লিষ্ট দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগ-সাজশে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এসব কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব ভিসায় মালয়েশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য বিএমইটিতে ভিসা প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি মালয়েশিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে জিটুজি প্লাস অর্থাৎ দুই দেশে সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনায় কর্মী পাঠাতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এ প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়া হতে নির্বাচিত বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী পাঠানো হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের নিবন্ধিত ১০৭৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে মাত্র দশটি এজেন্সিকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এ ধরনের সিন্ডিকেট গঠনের ফলে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের কাছে হতে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[৯৪]

---

[৯৩] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩,* ধারা ১৯ (৩)।

[৯৪] আরও জানার জন্য দেখুন পরিমল পালমা ও বেলাল হোসেন বিপ্লব, '১০ এজেন্টের মাধ্যমে জনশক্তি নিতে পারে মালয়েশিয়া', *ডেইলি স্টার,* ৩০ নভেম্বর ২০১৬।

ওপরের আলোচনা থেকে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ছাড়পত্র গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভিসা প্রতি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে (সারণি ৫ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৫: শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের চিত্র (২০১৬)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের খাত	২০১৬ সালে ভিসার সংখ্যা	ভিসা প্রতি আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে অনুমোদন	৬১,১২২	১৩,০০০ – ১৫,০০০
২	বিএমইটি	বহির্গমন ছাড়পত্রের অনুমোদন	৭,৫৭,৭৩১	১০০ – ২০০
৩	থানা পুলিশ	পুলিশ ছাড়পত্র	৭,৫৭,৭৩১	৫০০ – ১,০০০
	দেশভিত্তিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়			
৪	বিএমইটি	মালয়েশিয়ায় পেশাগত ভিসায় অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র	৪০,১২৬	৫,০০০ – ১৫,০০০

৩.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রধানত তিনটি পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ে গন্তব্য দেশের নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে একদিকে নিয়োগের কার্যাদেশ/ ভিসা কেনা-বেচা হয়, আবার অন্যদিকে গন্তব্য দেশে ভিসা অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইংয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। গন্তব্য দেশ থেকে কার্যাদেশ বা ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার করে এদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের কাছে ভিসা বিক্রি করা হয়। এ পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সাব-এজেন্ট বা দালালদের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে এবং তাদের কাছে দালালরা ভিসা বিক্রি করে। বিভিন্ন হাত ঘুরে ভিসা তাদের কাছে যাওয়ার কারণে ভিসার দাম বহুগুণে বেড়ে যায়। এছাড়া বিনামূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের কাছ থেকেও অবৈধভাবে টাকা আদায় করা হয় বলে জানা যায়।

প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় জটিল একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় যেখানে অনেকগুলো অংশীজন প্রতিষ্ঠান জড়িত। স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, নিবন্ধন, প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ, এবং চূড়ান্তভাবে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হয় বিদেশগামী কর্মীদের কাছ থেকে।

পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণ ও প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণ ও প্রভাব

পূর্বের অধ্যায়ে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান বলে দেখা যায়। এসব চ্যালেঞ্জের বেশ কিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। এ অধ্যায়ে এসব সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনের কারণ এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণ

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণগুলোকে আইনি ও প্রায়োগিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত - এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এসব কারণ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৪.১ আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রধান আইন 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩'তে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নির্দেশনা নেই। বাংলাদেশ থেকে সংঘটিত শ্রম অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশই (প্রায় ৯০ শতাংশ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও এ বিষয়ে এই আইনে কোনো উল্লেখ করা হয় নি। বরং অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কর্মসংস্থান চুক্তির দায়-দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্টের ওপর নিয়োগকারীর সাথে যৌথ ও এককভাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা অভিবাসন করে তাদেরকেও রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করতে হয়, যদিও সেই নিয়োগকারী ও অভিবাসী কর্মী সম্পর্কে রিক্রুটিং এজেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহিত থাকে না।

এই আইনের অনেক ধারা (কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়, যা আইনের শক্তিকে খর্ব করে। যেমন, আইনের ধারা-১৮তে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও তার বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি (পারভেজ ও অন্যান্য, ২০১৬)। এছাড়া এই আইনে অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করার ফলে এ খাতে সক্রিয় 'দালাল'দের কার্যক্রম কার্যত আইনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে পাঠানো সংক্রান্ত সব কার্যক্রম সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকবে[৯৫] বলা হলেও কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে তা বলা নেই।

এই আইন এখন পর্যন্ত তেমন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় নি, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার সংক্রান্ত বিভ্রান্তি। এই আইনের ১৪ ধারা প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও ক্ষেত্রবিশেষে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচার সম্পন্ন করার অনুমতি দেয়, যা আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারাকে খর্ব করে যেহেতু এই দুটি ধারায় বর্ণিত শাস্তি মোবাইল কোর্টের আওতার বাইরে। যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩২ ধারা অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারেন। আইনটিকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মোবাইল কোর্ট দুই বছরের বেশি কারাদণ্ড দিতে পারবে না।[৯৬]

বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেখা যায় ডাটাবেজে নিবন্ধিতদের মধ্য থেকে অভিবাসী কর্মী বাছাই করার যে প্রক্রিয়া আইনে বলা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। প্রকৃতপক্ষে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের নিজস্ব দালালদের মাধ্যমেই কর্মী বাছাই করে। উপরন্তু দালালদের মাধ্যমে কর্মী বাছাইয়ের পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য অফিস আদেশের মাধ্যমে ডাটাবেজের বাইরে থেকে কর্মী অনুমোদন দেওয়ার উদাহরণ লক্ষ করা যায়। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ে যেসব আবেদন পড়েছে সেগুলো ডাটাবেজ লঙ্ঘন করে অনুমোদন দেওয়ার জন্য একাধিকবার মন্ত্রণালয় থেকেও নির্দেশ আসার উদাহরণ রয়েছে।[৯৭]

---

[৯৫] *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩*, ধারা ৩ (১)।

[৯৬] রামরু, *Ensuring Prosecution under the Overseas Employment and Migration Act 2013*, পলিসি ব্রিফ ২০, ২০১৬।

[৯৭] উদাহরণস্বরূপ দেখুন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস আদেশ নং ৪৯.০০৩.৫১৪.০০.২০১০-১৮৩ (৬), ১৩ এপ্রিল ২০১৪। সূত্র: *প্রবাসী ম্যানুয়েল*, তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রম অভিবাসনের বিধিগুলোতেও কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। বহির্গমন বিধিমালায় ইমিগ্র্যান্ট রেজিস্ট্রার ও লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্যে কোনো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধ ও অনিয়মজনিত কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান এখানে নির্দিষ্ট করা হয় নি। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, ২০০২ সালের বিধিমালাই এখনো বিদ্যমান। ফলে এখনকার বাস্তবতায় এ খাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা একটি বড় কারণ। এসব সীমাবদ্ধতাকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

৪.২.১ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি

আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি: শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। একদিকে এ খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, অন্যদিকে বরাদ্দকৃত বাজেটও সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ছিল ৪৭০ কোটি ৯৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা (উন্নয়ন বাজেট প্রায় ৫০ শতাংশ), যার মধ্যে ৩৭২ কোটি ৬১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা (মোট বাজেটের প্রায় ৭৯ শতাংশ) ব্যয় হয় এবং ৯৮ কোটি ৩২ লাখ ২২ হাজার টাকা অব্যবহৃত ছিল।[৯৮] অন্যদিকে বিএমইটি'র জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল এই বরাদ্দের ৭০.৪৩ শতাংশ, যার প্রায় ৯৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু গন্তব্য দেশে শ্রম উইং-এর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের (৭২ কোটি ৪৭ লাখ ৮৮ হাজার টাকা) প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যয় করতে পেরেছে বলে দেখা যায়।

প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি: শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই জনবলের ঘাটতি রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদের হার প্রায় ৩৬.৭ শতাংশ, বিএমইটি'তে ১৮.৬ শতাংশ, ডেমোগুলোতে ৩৬.৮ শতাংশ এবং টিটিসিগুলোতে এই হার ৪৩.৮ শতাংশ।[৯৯] বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে জনবলের ঘাটতি থাকার কারণে প্রশিক্ষণে ঘাটতি থেকে যায়।[১০০]

আবার যেসব দেশে বাংলাদেশ থেকে খুব কম হারে (২-৩%) অভিবাসী কর্মী যায় সেসব দেশেও নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে, কিন্তু যেসব দেশে অভিবাসী কর্মীদের সংখ্যা ও যাওয়ার হার অনেক বেশি সেসব দেশে জনবল বাড়ানো হয় নি। অন্যদিকে শ্রম উইংগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে যারা মাঠ পর্যায়ে নিয়োগ আবেদন যাচাইয়ের কাজ করতে অনীহ, ফলে সেসব দেশে নিয়োগের চাহিদাপত্র যাচাইয়ে ঘাটতি রয়ে যায়।

৪.২.২ শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিকেন্দ্রীকরণের ঘাটতি

ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং রিক্রুটিং এজেন্টদের কার্যক্রমে বিকেন্দ্রীকরণের ঘাটতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়া করার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (রিক্রুটিং এজেন্ট, বিএমইটি, মন্ত্রণালয়, গন্তব্য দেশের দূতাবাস, স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র, ট্রাভেল এজেন্ট) কার্যালয় প্রধানত রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত, ফলে এসব কাজের জন্য অভিবাসী কর্মীদের একাধিকবার ঢাকায় আসতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিবাসী কর্মীরা স্বল্পশিক্ষিত ও (পল্লি অঞ্চল থেকে আসার কারণে) ঢাকার পরিবেশের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে দালালদের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

অন্যদিকে প্রায় সব রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যালয় ঢাকায় (এবং ক্ষেত্রবিশেষে চট্টগ্রামে), এবং মাঠ পর্যায়ে তাদের শাখা না থাকার ফলে অভিবাসী কর্মী বাছাইয়ের জন্য তাদের দালালদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ফলে সার্বিকভাবে এ খাতটি প্রধানত 'দালাল-নির্ভর'।

---

[৯৮] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১১।

[৯৯] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ৩।

[১০০] উল্লেখ্য, এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭৪ জন মুখ্য ইন্সট্রাক্টরের জায়গায় রয়েছে ২৮ জন, ২৪৪ জন উচ্চমান ইন্সট্রাক্টরের জায়গায় ১৩০ জন, এবং যেখানে ৩৯১ জন সাধারণ ইন্ট্রাক্টরের জায়গায় রয়েছে ২৯৬ জন। সূত্র: রামরু, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

৪.২.৩ বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিবাসী কর্মীকে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একাধিকবার বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি, তথা আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি দিতে হয়। এছাড়া দলীয় ভিসা ও অপ্রচলিত দেশের ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করতে হয়। এসব কর্মকাণ্ড এই প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে।

শ্রম শাখাগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে বা মিশনে শাখাগুলো কার অধীনে থাকবে তা নিয়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার অভিযোগ রয়েছে। জনশক্তি বাজারগুলোর পরিধি বাড়ানোর জন্য শ্রম শাখাগুলোর মাধ্যমে কাজ শুরুর কথা থাকলেও অন্য মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতার অভিযোগও রয়েছে।[১০১]

৪.২.৪ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি

গন্তব্য দেশে ভিসা কেনা-বেচা, গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থানের বৈধতা যাচাই, বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। শ্রম শাখাগুলোর সেবা দিতে গিয়ে ব্যর্থতার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ভৌগোলিকভাবে বড় আয়তনের দেশগুলোতে মিশনের অবস্থানগত দূরত্ব, দক্ষ কর্মকর্তা ও জনবলের অভাব, আইনি সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। এর মধ্যে সৌদি আরবের মতো বড় রাষ্ট্রগুলোর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে যে ধরনের যানবাহনের প্রয়োজন হয় তা নেই অনেক মিশনের। এ জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দও পাওয়া যায় না অনেক সময়।[১০২]

বাংলাদেশের শ্রম শাখায় নিয়োগ ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। একটি তুলনামূলক প্রতিবেদনে দেখা যায়, যেখানে শ্রীলঙ্কা তাদের দেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরই মিশনের শ্রম শাখায় নিয়োগ দেওয়া হয়, সেখানে বাংলাদেশে শ্রম শাখায় নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। বাংলাদেশে কোনো বিশেষায়িত দক্ষতাকে বিবেচনায় না নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের শ্রম শাখায় নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। মিশনগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের লবিং ও রাজনৈতিক দৌড়ঝাঁপের অভিযোগ রয়েছে। একটি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রী উপদেষ্টার আত্মীয় ও সুপারিশের প্রার্থী থাকে। তাদের মধ্যে শক্তির লড়াইয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থী নিয়োগ পায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৩]

৪.৩ প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনের কারণগুলোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা অন্যতম। এসব সীমাবদ্ধতাকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়া

পুরো শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াটি জটিল ও দীর্ঘ। তৃতীয় অধ্যায় থেকে দেখা যায় ভিসা সংগ্রহ থেকে শুরু করে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্টকার্ড পাওয়া পর্যন্ত ২৪ থেকে ২৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এর মধ্যে বিএমইটি'তে রয়েছে নয় থেকে ১১টি ধাপ। ভিসা সংগ্রহ করার জন্য বেশিরভাগ অভিবাসী কর্মী দীর্ঘদিন ধরে দালাল বা ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীকে টাকা দেন। ভিসা সংগ্রহের পর ভিসা প্রক্রিয়াকরণের পেছনে কমপক্ষে প্রায় আরও দুই থেকে তিন মাস ব্যয় হয়। বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে সত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচদিন এবং অসত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে সাত থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। এক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং এই লেনদেনের ওপর অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা নির্ভরশীল।

অন্যদিকে বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তি প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে এজেন্সি-নির্ভর। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের সুযোগ নেই। ওয়ান-স্টপ সেবা দেওয়া হয় খুব কম ব্যক্তিকে। বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে মাত্র ৩০১ জনকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়ান-স্টপ সেবা দেওয়া হয়েছে।

---

[১০১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'লবিং ও দলীয় নিয়োগের কারণেই ব্যর্থ মিশনগুলোর শ্রম শাখা', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৯ নভেম্বর, ২০১৪, http://www.bd-pratidin.com/last-page/2014/11/19/44504

[১০২] রামরু, ২০১৪, 'ইন্সটিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং অব দ্য অফিস অব লেবার অ্যাটাশে: বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা'।

[১০৩] রামরু, ২০১৪, 'ইন্সটিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং অব দ্য অফিস অব লেবার অ্যাটাশে: বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা'।

ডাটাবেজ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

বিএমইটি'র ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ডাটাবেজ কতটুকু কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য তা প্রশ্নযোগ্য। নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসনের জন্য ইচ্ছুক কর্মীদের বিএমইটি'র ডাটাবেজে নিবন্ধন করার কথা, এবং এই ডাটাবেজ থেকে নিয়োগকারীর চাহিদা অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টদের কর্মী বাছাই করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এটি কার্যকর নয়। নিয়ম অনুযায়ী সৌদি আরবে অভিবাসন করার ক্ষেত্রে এই ডেটাবেইজ থেকেই কর্মী বাছাই করতে হবে। তবে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে ২০১৩ সালের আগে যাদের অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাদের এই নিবন্ধন প্রয়োজন নেই, এবং এর বিনিময়ে পাসপোর্ট-প্রতি ১৫,০০০ টাকা করে ঘুষ আদায় করা হয় বলে অভিযোগ ছিল।

আবার এই ডাটাবেজ ব্যবহার করাও বাস্তবসম্মত নয়। এ ডাটাবেজে কোন দেশে কী কাজে যেতে ইচ্ছুক তার শ্রেণিবিভাজন করা নেই। আবার অনেকে আগে নিবন্ধিত হলেও পরবর্তীতে অনেকের যাওয়ার আগ্রহ থাকে না বা চাকরি পেয়ে যায়। এছাড়া এজেন্সিরা যেহেতু ভিসা বিক্রি করে সেহেতু অপরিচিত কর্মীরা তাদের কাছ থেকে ভিসা কিনতে চায় না। তারা দালালের ওপর নির্ভর করে এবং তাকেই টাকা দিয়ে অভিবাসন করতে চায়।

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা

দালাল-নির্ভর শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া: শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াটি প্রায় পুরোটাই 'দালাল-নির্ভর'। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে অভিবাসী কর্মীর সরাসরি যোগাযোগ প্রায় অনুপস্থিত। বিদেশে নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলী সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির জন্য অভিবাসী কর্মীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দালালদের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে কর্মী বাছাই, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ভিসা প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা ইত্যাদির জন্য রিক্রুটিং এজেন্টরাও দালালদের ওপর নির্ভরশীল। এসব কারণে অভিবাসী কর্মীদের একটি বড় অংশই আর্থিক লেন-দেনে কোনো রশিদ নিতে পারে না, ফলে এ খাতে ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ অনুপস্থিত রয়ে যায়।

কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের সুযোগ: এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের দালালদের কাছে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের সুযোগ থাকে। সাধারণত অভিবাসনেচ্ছু কর্মীদের একসাথে ভিসা ও অন্যান্য খরচের জন্য পুরো টাকা দেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। তারা অল্প পরিমাণ করে টাকা দালালের কাছে জমা রাখে এবং ভিসা নিশ্চিত হওয়ার পর বাকি টাকা জোগাড় করে। এই সুবিধার জন্যও দালালদের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অর্থ পাচার: বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (ধারা ৩৩) অনুযায়ী অবৈধভাবে কাজের চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহ বা কেনা-বেচা করা দণ্ডণীয় অপরাধ। ফলে গন্তব্য দেশে ভিসা কেনার জন্য অবৈধ প্রক্রিয়ায় (যেমন হুন্ডি) অর্থ পাঠানো হয়।

অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি

সকল দেশের জন্য সরকারিভাবে অভিবাসনের ব্যয় নির্ধারিত নেই। বর্তমানে কেবল সৌদি আরবের জন্য জন্য অভিবাসনের সর্বোচ্চ ব্যয় এক লাখ ৬৫ হাজার টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে ২০১৬ সালের ৩০ আগস্ট। এই ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত টিকেট, সরকার-নির্ধারিত বিভিন্ন ফি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পাসপোর্ট ও রিক্রুটিং এজেন্সির ব্যয়। কিন্তু বাস্তবে সৌদি আরবে শ্রম অভিবাসনে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হলেও রিক্রুটিং এজেন্সি এই পরিমাণ টাকারই রশিদ দেয়। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীরা টাকা সরাসরি এজেন্টকে না দিয়ে দালালের মাধ্যমে দেয়। ফলে একদিকে অন্যান্য দেশের জন্য ভিসা/ অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয় কত হচ্ছে সে সংক্রান্ত তথ্য যেমন সরকারের কাছে নেই, তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি থাকায় কোনো অভিবাসী কর্মী প্রতারিত হলে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে তা নির্ধারণ করা যায় না, এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পায় না।

অভিবাসী কর্মীর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি

বাংলাদেশে কর্মক্ষম তরুণদের একটি বিশাল অংশ কাজ নিয়ে দেশের বাইরে যেতে আগ্রহী। এসব সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী যেকোনো মূল্যে ভিসা কিনতে চায়, এবং দালালদের কাছে টাকা জমা রাখে। অন্যদিকে গন্তব্য দেশে কর্মীর চাহিদা সীমিত, এবং বেশ কয়েকটি প্রধান গন্তব্য দেশে গত কয়েকবছর শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল। ফলে সেসব দেশেও বৈধ উপায়ের বাইরে গিয়ে অভিবাসনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গন্তব্য দেশে ভিসা ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, এবং মধ্যস্বত্বভোগীদেরও অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা তৈরি হয়।

অভিবাসী কর্মীর অসচেতনতা

বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কর্মীদের একটি বড় অংশেরই শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান। অভিবাসন প্রক্রিয়ার জটিলতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এবং একইসাথে সামাজিক যোগাযোগের কারণে দালালদের ওপর তাদের আস্থা ও নির্ভরতা রয়েছে। শ্রম অভিবাসন সম্পর্কে তথ্যের জন্য তারা দালালদের ওপরই নির্ভর করে, এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করে। শ্রম অভিবাসন সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণাও তৈরি হয়। সরকার বা অন্য কোনো অংশীজনের সাবধান বাণী তারা গ্রাহ্য করে না।

তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশে ঘাটতি: বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকা জরুরি। বর্তমানে ৪২টি জেলায় ডেমো কার্যালয় থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর তথ্য দেওয়া হয়, এবং কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার এ ধরনের তথ্য প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে। বিদেশ যাওয়ার আগে বিএমইটি'তে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যেখানে বিদেশে কর্মসংস্থান নিয়ে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু এসব কার্যক্রম খুব সীমিত পর্যায়ের, এবং সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন কোন দেশে কী ধরনের কাজ করা যায়, কোন কাজে কী ধরনের বেতন, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু বিদেশে কাজ করতে যেতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তথ্য পেতে গেলে অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি যেমন দালালদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোতেও (যেমন মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বায়রা) এ ধরনের তথ্য প্রচার করা হয় না।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশে ঘাটতি: শ্রম অভিবাসনের পুরো প্রক্রিয়াটি জটিল, এই প্রক্রিয়ায় অনেগুলো ধাপ পার হতে হয় এবং এর সাথে অনেক ধরনের অংশীদার প্রতিষ্ঠান জড়িত। কিন্তু অদক্ষ হিসেবে বিদেশগামী কর্মীদের বেশিরভাগই পল্লি অঞ্চল থেকে আসার ফলে তারা এ প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত থাকে না, আর ফলে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাদের নির্ভর করতে হয় দালালদের ওপর। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ডেমোগুলোতে শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু বুকলেট রয়েছে, কিন্তু এগুলোর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।[১০৪] আবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল, বা এমনকি বায়রার ওয়েবসাইটগুলোতেও শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সহজবোধ্য ভাষায় পরিষ্কার তথ্যবহুল কিছু দেওয়া নেই।

৪.৪ আইন প্রয়োগে ঘাটতি

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ হয় নি বলে লক্ষ করা যায়। প্রণয়নের পর থেকে মানব পাচারের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ২০১৩' আইনের অধীনে মামলা না হওয়ার প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত ২০১৫ সালের ৫ মার্চ সরকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য রুল জারি করে।[১০৫] এখন পর্যন্ত এ আইনের অধীনে আটটি মামলা দায়ের করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো বিচার সম্পন্ন হয় নি।[১০৬] প্রতারণার অনেক ঘটনা থাকলেও প্রতারিতরা এই আইনের অধীনে আইনি ব্যবস্থা নিতে উদ্বিগ্ন থাকে কারণ তারা মনে করে যে তারা আর বিদেশে কাজ করতে যেতে পারবে না। এই আইনের অধীনে বিচার নিশ্চিত না করার পেছনে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, শক্তিশালী প্রভাবশালী মহলের পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি দেখানো এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি কারণ হিসেবে কাজ করে।[১০৭]

আবার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের একটি বড় অংশই একদিকে নিষ্পত্তি হয় না বলে দেখা যায়, আবার অন্যদিকে নিষ্পত্তি হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ পুরোটা আদায় করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৮০টি অভিযোগের মধ্যে ৮৯টি অভিযোগ (২৩.৪২%) অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে মোট আট লাখ ৯০ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে

[১০৪] উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিএমইটি কর্তৃক বিতরণকৃত লিফলেটের সংখ্যা ৫৫ হাজার, ৩৮ হাজার পুস্তিকা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে ২০১৬ সালেই অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা ছিল সাত লাখ ৫৭ হাজারের বেশি। সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ২২।

[১০৫] এই রুল জারি করা হয় রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট-এর (রামরু) করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতে। সূত্র: *ডেইলি স্টার*, 'হেলপিং ইলিগ্যাল মাইগ্রেশন: হোয়াই নট ফাইলিং কেসেস এগেইনস্ট অফেনডারস আনডার মাইগ্রেশন অ্যাক্ট', ৬ মার্চ ২০১৫।

[১০৬] ২০১৬ সালের ১৫ নভেম্বর বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ওপর রামরু আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত আলোচনা অনুযায়ী।

[১০৭] রামরু, *Ensuring Prosecution under the Overseas Employment and Migration Act 2013*, পলিসি ব্রিফ ২০, ২০১৬।

১০ হাজার টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়।[১০৮] অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৫-২০১৬ সালে দুটি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয় আর সাতটি লাইসেন্স স্থগিত করা হয়।[১০৯]

বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে আরও গতিশীল ও দক্ষ করে তোলা, রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকাণ্ডে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ভিসা নিয়ে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং বিদেশগামী কর্মীদের অবৈধ ও অনিয়মিত অভিবাসন রোধ করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (ইমিগ্রেশন পুলিশ, এস.বি, বিজিবি, আনসার ভিডিপি, এনএসআই ও র‍্যাব) সদস্যদের সমন্বয়ে ২৩ সদস্যের একটি স্থায়ী ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স ২০১২ সালের মার্চ মাসে গঠন করা হয়।[১১০]

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধ করার উদ্দেশ্যে অবৈধ অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত বহির্গমন রুটসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। টাস্কফোর্স রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠান, অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত প্যাথলজিক্যাল ল্যাব/ক্লিনিক পরিদর্শন করে। এসব অভিযান পরিচালনার মূল লক্ষ্য কোনো কর্মী যেন প্রতারণার শিকার হয়ে অবৈধভাবে কিংবা বেশি ব্যয় করে বিদেশে না যায়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কর্মীরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্য হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও কাগজপত্র (পাসপোর্ট, নিয়োগকারী দেশের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা, বিএমইটি'র বহির্গমন ছাড়পত্র ইত্যাদি) পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে অবৈধ অভিবাসনকারীদের কাগজপত্র জব্দ করা হয় এবং যাত্রাবিরতি করা হয়।[১১১]

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে অবৈধ অভিবাসনে সহায়তাকারী মধ্যস্বত্বভোগী/দালালদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিএমএইটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিভিন্ন দেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া, আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে রিক্রুটিং/ ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো ও মামলা দায়ের, উক্ত আইনের আওতায় অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা, এবং র‍্যাব নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দুইটি রিক্রুটিং এজেন্সিকে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের অপরাধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ৩২ ধারায় জরিমানায় দণ্ডিত করা হয়।[১১২] তবে এসব শাস্তি কতটুকু কার্যকর, এবং শাস্তির ফলে কোনো প্রভাব পড়ে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

৪.৫ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

আইওএম-এর ব্যবহৃত সূচক ও অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিতে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য সুশাসনের যেসব নির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, এবং আইনের শাসন। এসব নির্দেশকের ভিত্তিতে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়:

১. **স্বচ্ছতার** মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে অভিবাসন সম্পর্কে (ব্যয়, শর্ত, প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয়, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত নয়, এবং অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ থাকে না।

২. **জবাবদিহিতার** মধ্যে শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমের শক্তিশালী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় কাজের বিভাজন, এবং সব অংশীজনের জবাবদিহিতা অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঘাটতি, একাধিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজ সম্পাদন, এবং সব অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা উল্লেখযোগ্য সুশাসনের ঘাটতি।

---

[১০৮] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১৮। আবার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট ৮২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে মোট ৫০ লাখ ৩৯ হাজার ৪০০ টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে ৬১ হাজার ৫০০ টাকা। সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*, পৃ. ১১।

[১০৯] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১৮।

[১১০] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*, পৃ. ১৩।

[১১১] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ২০।

[১১২] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ২০।

৩. **সক্ষমতা ও কার্যকরতার** মধ্যে রয়েছে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামো, মসৃণ ও দ্রুত অভিবাসন প্রক্রিয়া, এবং শ্রম অভিবাসনের স্বল্প ব্যয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, শ্রম অভিবাসন জটিল, দীর্ঘ, অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি-নির্ভর, এবং সর্বোপরি উচ্চ ব্যয়-সম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত।

৪. সবশেষে **আইনের শাসন** নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো ও আইনের সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আইনি সীমাবদ্ধতা, আইনের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং ন্যায্য ও সঠিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে না পারা এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

সারণি ৬: সুশাসনের মানদণ্ডে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	সমস্যা
স্বচ্ছতা	▪ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ▪ অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ	▪ অভিবাসন সম্পর্কে (ব্যয়, শর্ত, প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয় ▪ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত নয় ▪ অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ থাকে না
জবাবদিহিতা	▪ শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমের শক্তিশালী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ▪ অভিবাসন ব্যস্থাপনায় কাজের বিভাজন ▪ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা	▪ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঘাটতি ▪ একাধিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজ সম্পাদন ▪ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	▪ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামো ▪ মসৃণ ও দ্রুত অভিবাসন প্রক্রিয়া ▪ শ্রম অভিবাসনের স্বল্প ব্যয়	▪ জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি ▪ জটিল, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ▪ অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি-নির্ভর প্রক্রিয়া ▪ উচ্চ ব্যয়-সম্পন্ন প্রক্রিয়া
আইনের শাসন	▪ প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো ▪ আইনের সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রয়োগ	▪ আইনি সীমাবদ্ধতা ▪ আইনের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা ▪ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান ▪ ন্যায্য ও সঠিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায় না

৪.৬ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে যার পেছনে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। এর ফলে নিচের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা যায়।

অবৈধভাবে অর্থ পাচারের ফলে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব

গন্তব্য দেশে নিয়োগ অনুমোদন ও কর্ম ভিসা ক্রয় করার পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয় তা হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধভাবে পাচার করা হয়, যার নেতিবাচক প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়ে। ২০১৬ সালের শ্রম অভিবাসনের উপাত্ত থেকে প্রাক্কলন করে দেখা যায় এই বছর ভিসা কেনার খাতে ৫,২৩৪ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে, যা এই বছর রেমিট্যান্স থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৪.৮৮ শতাংশ।

উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল না পাওয়া

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে মধ্যস্বত্বভোগীদের জড়িত হওয়া, অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা এবং একইসাথে সরকারি অংশীজন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে অভিবাসন ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে যায়, যা বহন করতে হয় অভিবাসী কর্মীকেই। এ গবেষণায় কয়েকটি দেশের ভিসা বাণিজ্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় গন্তব্য দেশের নিয়োগকারী থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের দালালদের কাছে ভিসার বিক্রয়মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এছাড়া ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময়ে অভিবাসী কর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম না থাকলে একজন অভিবাসী কর্মী অনেক কম সময়ে তার ব্যয় উঠিয়ে আনার পাশাপাশি আরও বেশি আয় করতে পারত। ফলে দেখা যাচ্ছে শ্রম অভিবাসনের সুফল একজন অভিবাসী কর্মী প্রত্যাশিত পর্যায়ে পাচ্ছে না।

সরকার-নির্ধারিত ব্যয়ের কত শতাংশ কোন কোন খাতে ব্যয় হয় তার একটি উদাহরণ সৌদি আরবে শ্রম অভিবাসনের ব্যয় বিশ্লেষণ করলে। দেখা যায় এই দেশের জন্য সরকারের নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয় হচ্ছে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। যদি এই টাকা ব্যয় করে অভিবাসন সম্পন্ন হয় তাহলে এর প্রায় ২৯ শতাংশ ব্যয় হয় টিকেট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিভিন্ন ফি'র পেছনে, আর বাকি ৭১% রিক্রুটিং এজেন্সির পেছনে। বর্তমান

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী সৌদি আরবে অভিবাসনের জন্য বর্তমানে গড়ে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যায় এই ব্যয়ের প্রায় ১১ শতাংশ ব্যয় হয় টিকেট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিভিন্ন ফি'র পেছনে, আর বাকি ৮৯ শতাংশ রিক্রুটিং এজেন্সির পেছনে (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৭: সৌদি আরবে শ্রম অভিবাসনের ব্যয়ের খাত

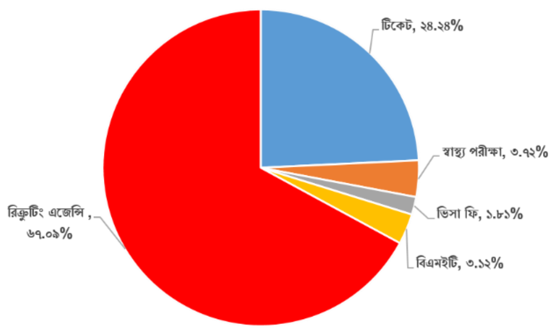

সরকার নির্ধারিত ব্যয় ১,৬৫,০০০ টাকা

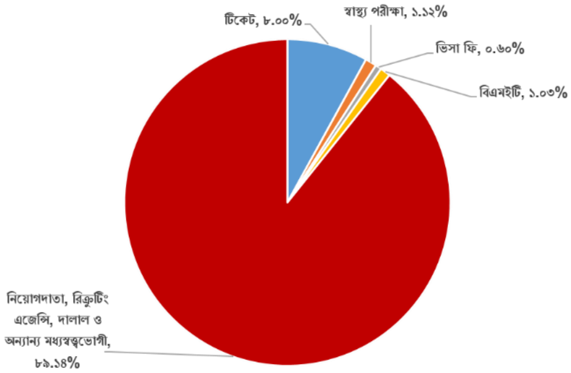

ন্যূনতম প্রকৃত ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা

প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

ভিসা সংগ্রহ প্রক্রিয়ার প্রায় পুরোটাই অনানুষ্ঠানিক হওয়ার কারণে অর্থের লেন-দেনে কোনো দলিলপত্র থাকে না। এছাড়া কাজের ধরন, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, শর্ত, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণের ব্যয় ইত্যাদির সংক্রান্ত তথ্যে অভিগম্যতা না থাকার ফলে বিদেশগামী কর্মীদের প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। আবার একইভাবে কাজের ধরন, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, শর্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা না থাকার কারণেও গন্তব্য দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাওয়া কর্মীদের ৭৭ শতাংশই প্রতিশ্রুত মজুরি পান না।[১১৩] এছাড়াও বিদেশে গিয়ে কাজ না পাওয়া, গ্রেফতার হওয়া ও বহিষ্কারের মতো ঘটনারও শিকার হন অনেক অভিবাসী কর্মী।[১১৪]

প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া

ভিসা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের পেছনে অভিবাসী কর্মীরা যে ব্যয় করে তার একটি বড় অংশেরই কোনো দলিল-পত্র বা রশিদ থাকে না। শ্রম অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত সীমার অনেক বেশি ব্যয় হলেও সেটি প্রমাণ করার মতো কাগজ-পত্র অভিবাসী কর্মী দেখাতে পারে না। ফলে প্রতারিত হওয়ার পর কোনো এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার-নির্ধারিত ব্যয়ের পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় যা প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮৯টি ক্ষেত্রে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে মোট আট লাখ ৯০ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে ১০ হাজার টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়।[১১৫]

কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি

গত বেশ কয়েকবছর ধরে কাজের জন্য অবৈধ উপায়ে ও পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ার পেছনে শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের ঘাটতিকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (রশিদ ও আশরাফ, ২০১৬)। এ গবেষণায় দেখা যায় ভিসার কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ফলে ভিসার উচ্চমূল্য, বেশ কয়েকটি প্রধান শ্রম গ্রহণকারী দেশে আনুষ্ঠানিক শ্রম অভিবাসন বন্ধ থাকা, তদারকির ঘাটতি ও আইনের

---

[১১৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রাজীব আহমেদ, 'বিদেশে ৭৭% শ্রমিকই মজুরিতে ঠকেন', *প্রথম আলো*, ৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

[১১৪] উদাহরণ হিসেবে দেখুন সৌদি আরবে কাজ হারানো আরও ৩০ জন ফিরছেন আজ, *প্রথম আলো*, ১৭ নভেম্বর ২০১৬; 'ওমানে গৃহপরিচারিকা নির্যাতন নিয়ে এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন: 'আমাকে বেচে দেওয়া হয়', *প্রথম আলো*, ১৪ জুলাই ২০১৬; 'চাকরির নামে ইরাকে ২১ জনকে বিক্রি', *প্রথম আলো*, ১৯ মে ২০১৬; 'সুদানে প্রতারিত ২২ বাংলাদেশী দেশে ফিরলেন', *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪; শরিফুল হাসান, 'খরচের টাকা ওঠেনি, ইরাক ছাড়তে চান না বাংলাদেশিরা', ২২ জুলাই ২০১৪।

[১১৫] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬*, পৃ. ১৮। আবার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট ৮২টি ক্ষেত্রে প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে মোট ৫০ লাখ ৩৯ হাজার ৪০০ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে ৬১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*, পৃ. ১১।

দুর্বল প্রয়োগের কারণে বিভিন্ন দেশে অবৈধ পথে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ায় ২০০৭-০৮ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী কর্মী নেওয়া বন্ধ থাকলেও অন্য ধরনের ভিসা যেমন ছাত্র ভিসা বা পর্যটন ভিসায় মালয়েশিয়ায় গিয়ে অবৈধভাবে কাজ করা বন্ধ হয় নি। অন্যদিকে বৈধ পথে যাওয়ার চেয়ে খরচ কম হওয়ায় অজানা সংখ্যক ব্যক্তি কাজের উদ্দেশ্যে হলেও পরবর্তীতে মানবপাচারের শিকার হয়ে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছে বলে দেখতে পাই। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয় কমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় তিন বছরে সাগরপথে পাচার হওয়া মানুষের সংখ্যা এক লাখ ২০ হাজার।[১১৬] একইভাবে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও কর্মভিসা ছাড়া ভিন্ন ধরনের ভিসা নিয়ে অবৈধভাবে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

শ্রম অভিবাসনের পেছনে বিপুল অংকের টাকা খরচ করার পর অভিবাসী কর্মীদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে তা যত কম সময়ে সম্ভব উঠিয়ে আনা। অতিরিক্ত আয় করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীরা চুক্তি ভঙ্গ করে চাকরি পরিবর্তন, চুক্তি ভঙ্গ করে একাধিক চাকরিতে নিয়োজিত হওয়া, চুক্তির সময় পার হয়ে গেলেও অতিরিক্ত সময় অবস্থান করতে বাধ্য হয়। এসব কারণে বাংলাদেশী কর্মীদের অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৪.৭ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত কারণ রয়েছে। শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১১৬] শরিফুল হাসান, 'ইউএনএইচসিআর-এর তথ্য: সাগরপথে তিন বছরে সোয়া লাখ মানব পাচার', *প্রথম আলো,* ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন অভিযোগ উত্থাপন, কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়াও আইনের প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে এখনো প্রয়োগ হচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত, এবং এখনো প্রায় ঢাকা-কেন্দ্রিক, যা এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের ঝুঁকি তৈরি করে। এ প্রক্রিয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও প্রক্রিয়া নির্ভর, ফলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও প্রতারিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের অভাবে প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পায় না। তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান, যে কারণে গন্তব্য দেশে কর্ম পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের খাত সম্পর্কে তথ্য অভিবাসী কর্মীর পক্ষে সহজে জানা সম্ভব হয় না, এবং এর জন্য সে বেশি নির্ভর করে দালালদের ওপর।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্যর ফলে যার ফলে অভিবাসন ব্যয় আরও বেড়ে যায় এবং অভিবাসী কর্মীর ওপর এই ব্যয়ভার পড়ে। ফলে প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল পাওয়া যায় না। শ্রম অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়ের কারণে কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ৮: একনজরে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা ▪ জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়া ▪ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি - অর্থ, জনবল ▪ বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি ▪ অভিবাসী কর্মীর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি ▪ অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি ▪ তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ▪ প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি	▪ অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি ▪ ভিসা কেনার জন্য অবৈধভাবে অর্থ পাচার ▪ নিয়োগদাতার তথ্য যাচাই না করে ও অর্থের বিনিময়ে সত্যায়ন ▪ অভিবাসী কর্মীদের উচ্চমূল্যে ভিসা ক্রয় ▪ অভিবাসী শ্রমিকের ওপর উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ভার ▪ দালাল-নির্ভর ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (চাহিদাপত্র সত্যায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, নিয়োগ-অনুমতি, বহির্গমন ছাড়পত্র) অবৈধভাবে অর্থ আদায় ▪ প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া	▪ প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিপূর্ণ সুফল না পাওয়া ▪ প্রতারিত, বঞ্চিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি ▪ বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

৫.২ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩'-এর নিম্নলিখিত সংস্কার করতে হবে:

- কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে;

- "অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন অগ্রাধিকার পাবে" এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ওয়ান স্টপ সেবা কার্যকর করতে হবে।

৩. বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে বেশি কর্মী যায় সেসব দেশে কর্মসংস্থান তদারকির ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইং-এর সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৪. দালালদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য তাদেরকে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব-এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করতে হবে।

৫. সরকারি নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

৭. অভিবাসী কর্মীর ছবি ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে কার্যকর সমন্বয় করতে হবে।

৮. সকল গন্তব্য দেশের ভিসা অনলাইন চেকিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতে সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

৯. সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য

- শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয় যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য করতে হবে;
- তৃণমূল পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা (রেডিও, টেলিভিশনে সম্প্রচার, তথ্যমেলা, পথ নাটক) বাড়াতে হবে;
- মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রার ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন তথ্য (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গবেষণা

অর্থ অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

তাসনিম সিদ্দিকী ও মো. আব্দুর রশীদ (সম্পাদিত), ২০০৯, রামরু, ঢাকা।

রামরু, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

টিআইবি, ২০১২, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২*, সার-সংক্ষেপ, ঢাকা।

Achacoso, TD, 2002, 'The International Labour Migration Institutions of Bangladesh, India, Sri Lanka in Ferment: The Philippines as Catalyst', International Organization for Migration, Regional Office at South Asia, Dhaka.

ADB, 2016, 'Overseas Employment of Bangladeshi Workers: Trends, Prospects, and Challenges', Brief 63.

Afsar, R, Mohammad Yunus, ABM Shamsul Islam, 2001, 'Are Migrants Chasing the Golden Deer? A Study on Cost-Benefit Analysis of Overseas Migration', BIDS, Dhaka.

Afsar, R., 2009, 'Unravelling the Vicious Cycle of Recruitment: Labour Migration from Bangladesh to the Gulf States' Working paper, International Labour Office, Geneva.

Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), 2014, 'Profiling on Returning Migrant Workers of Bangladesh' Study Report, ILO Country Office for Dhaka

Betts. A., 2010, 'Migration Governance: Alternative Future', Background paper, International Organization for Migration, Geneva, Switzerland.

Betts. A., 2011, 'Global Migration Governance', Oxford Scholarship Online, Vol:Jan-11.

Chikanda, A, Jonathan Crush, Margaret-Walton Roberts (eds), 2016, *Diasporas, Development and Governance*, IOM, Springer, Switzerland.

Harun-Or-Rashid, M., 'Ensure Better Governance for Safe Migration', *The Daily Star*, 18 December 2015.

Hoque, R. 2014, *Protecting Migrant Workers from Bangladesh- A Study of Legal Compliance with Migrant Worker's Rights*. National Human Rights Commission (JAMAKON), Bangladesh.

http://cmsny.org/wp-content/uploads/Shahidul-Haque-Fundamentals-of-National-Migration-Governance.pdf (24 May 2016)

http://eservices.mol.gov.ae/LabourMobility/attachments/babar-theme4E.pdf (24 May 2016)

http://www.cepn-paris13.fr/epog/wp-content/uploads/2014/10/PECOUD_betts-intro-mig-gov.pdf (24 May 2016)

http://www.migrationpolicy.org/article/labor-migration-united-arab-emirates-challenges-and-responses (24 May 2016)

http://www.migrationpolicy.org/article/working-hard-money-bangladesh-faces-challenges-large-scale-labor-migration (24 May 2016)

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190600/overseas-employment-ban-workers.pdf

https://www.iom.int/migration-policy-practice

ILO, 2014, 'The Cost: Causes of and potential redress for high recruitment and migration costs in Bangladesh', ILO Country office for Bangladesh, Dhaka.

IOM, 2015, 'Migration Governance Framework', IOM Council 106th Session.

IOM, 2016, *The 2016 Migration Governance Index*, http://iomgmdac.org/wp-content/uploads/2016/05/Migration-Governance-Index.pdf (accessed on 12 May 2016).

IOM, http://iomgmdac.org/

Kunz, R, Sandra Lavenex, Marion Panizzon (eds), 2011, *Multilayered Migration Governance: The Promise of Partnership*, Routledge, London.

Murshid, KAS, Kazi Iqbal, Meherun Ahmed, 2001, 'A Study on Remittance Inflows and Utilization', BIDS, Dhaka.

OKUP (Ovibashi Karmi Unnayan Program) (undated), *Policy Review: Mandatory Health Test of Migrant Workers*.

Purvez, S. A., S. B. Islam, M. M. Islam, 2016, *Irregular Labour Migration from Bangladesh: Crises and Ways Forward*, Manusher Jonno Foundation (MJF), Dhaka, Bangladesh.

Rahman, M M, 2011, 'Recruitment of Labour Migrants for the Gulf States: The Bangladeshi Case', ISAS Working Paper No. 132, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore.

Rahman. M. M., 2011, 'Does Labour Migration Bring about Economic Advantage? A Case of Bangladeshi Migrants in Saudi Arabia', ISAS Working Paper, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, Singapore.

Rashid, SR., ASM Ali Ashraf, 2016, 'Asian Boat People and the Challenges of Migration Governance: A Source Country Perspective', *Middle East Institute*. http://www.mei.edu/content/map/asian-boat-people-and-challenges-migration-governance-source-country-perspective (7 February 2017)

RMMRU, 2002, 'Rectruitment and Placement of Bangladeshi Migrant Workers: An Evaluation of the Process', International Organization for Migration, Regional Office at South Asia, Dhaka.

Shah, M. N. 2008, 'Recent Labour Immigration Policies in the Oil Rich Gulf: How effective are they likely to be?', ILO Asian Regional Paper on the Governance of Labour Migration, Working Paper No. 3.

Siddiqui, T. & Billah, M. M. 2012, *Labour Migration from Bangladesh 2011: Achievements and Challenges*. Dhaka: RMMRU.

Siddiqui, T. (ed), 2000, *State, Migrant Workers and the Wage Earners Welfare Fund*, Occasional Paper 2, RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. (ed.), 2002, *Beyond the Maze: Streamlining the Labour Recruitment Process in Bangladesh,* RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. 1998, *National Responsibility towards the Migrant Workers*, Occasional Paper 1, RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. 2009, *International Labour Migration and Remittance Management in Bangladesh*, Occasional Paper 19, RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. and others, 2010, 'Targeting Good Governance: Incorporation of Migration in the 6th Five Year Plan', RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. and Raisul Awal Mahmood, 2015, *Impact of Migration on Poverty and Local Development in Bangladesh,* RMMRU, SDC, Dhaka.

Siddiqui, T. *et al*, 2016, *Labour Migration from Bangladesh 2015: Achievements and Challenges*, RMMRU, Dhaka.

Siddiqui, T. Sultana Razia, Md. Rashed Alam Bhuiyan, 2012, *Recruitment Practices in Bangladesh and Protection of Migrant Workers' Rights*, ILO / University of Dhaka and Winrock International, Bangladesh, Geneva, International Labour Office.

Siddiqui, T., 2011, 'Recruitment Cost in Bangladesh: Challenges of Governing Migration in the Countries of Origin', presented in the Strengthening Dialogue to Make Migration Work for Development in the ESCAP and ESCWA Regions, 28-30 June, Beirut, Lebanon.

Siddiqui, T., CR Abrar, 2001, 'Contribution of Returnees: An Analytical Survey of Post Return Experience', RMMRU, Dhaka.

The Asia Foundation, 2013, 'Labour Migration Trends and Patterns: Bangladesh, India and Nepal', Joint Research by Asia Foundation Nepal, RMMRU, CREHPA and CORT.

The Economist Intelligence Unit. 2016. *Measuring well-governed migration: The 2016 Migration Governance Index,* The Economist Intelligence Unit, London.